হে মহাজীবন

নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

হে মহাজীবন

নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

রে অ্যাণ্ড অ্যাসোসিয়েটস্ (পাবলিশিং)
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা—৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
ডিসেম্বর ১৯৮৭

প্রকাশক ঃ
পি. রায়
রে অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস্ (পাবলিশিং) এর পক্ষে
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা—৭০০০০৬

মুদ্রক ঃ
নিতাই সামন্ত
পুষ্প প্রিন্টার্স
১৫এ অনাথ দেব লেন
কলকাতা—৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ
ইন্দ্রনীল ঘোষ

পরিবেশক ঃ
ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিমিটেড
৫৭ সি কলেজ ষ্ট্রীট
কলকাতা—৭০০০৭৩

মূল্য—১০·০০ টাকা

॥ হে মহাজীবন ॥



হে মহাজীবন

একটা ফুটফুটে ছোট্ট ছেলে। তখনো সে ভালো করে কথা বলতে শেখে নি। তবু আধো আধো করে অনেক কথাই সে বলতে পারে।

ছেলেটা দেখতে খুব সুন্দর। টক্‌টক্ করছে গায়ের রঙ। যে দেখে সেই তাকে কোলে তুলে নেয়। ভালবাসে। তাকে একবার দেখলে আদর না করে যাবার কারো সাধ্য নেই।

একদিন ছেলেটা তাদেরই বাড়ির সামনে রাস্তায় বসে ধুলো মাটি নিয়ে খেলা করছিল। একা একা। সঙ্গে আর কেউ নেই। মা রান্নাঘরে রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। আপন মনেই খেলে চলেছে সে।

হাতে করে শুধু ধুলো তুলছে আর ফেলছে। তার সারা গা প্রায় ধুলোয় মাখামাখি।

অনেকক্ষণ আগে মা রান্নাঘর থেকে এসে একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেছেন ছেলে খেলা করছে। কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই তার। গায়ে ধুলো মাটি মেখেছে—মাখুক। স্নান করার সময় সব ধুয়ে যাবে। তাকে নিয়ে মায়ের কোন চিন্তা নেই। সময় মত একটু খাইয়ে দিলেই হল। কান্নাকাটি করে না, কোন রকম বায়নাও নেই তার। শুধু খেলা আর খেলা।

ছেলেটা যেখানে বসে খেলা করছিল সেই রাস্তা দিয়ে সেদিন একটা ছেলেধরা যাচ্ছিল।

এমন একটা সুন্দর ফুটফুটে ছেলেকে খেলা করতে দেখে ছেলেধরা লোকটা থমকে দাঁড়াল তার কাছে। বেশ কিছুক্ষণ সময় লোকটা ছেলেটাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। একটু কৃত্রিম হাসি হাসল সে। লোকটাকে হাসতে দেখে ছেলেটাও তার মুখের দিকে তাকিয়ে খুব মিষ্টি করে একটু হাসল। তারপর আবার খেলতে শুরু করে দিল।

এবারে আরো কাছে এগিয়ে এল লোকটা। খুব আলতো করে একটা হাত রাখল ছেলেটার গায়ে। আশ্চর্য। ছেলেটার সেদিকে যেন খেয়ালই নেই।

লোকটা এবার আরো কিছুক্ষণ তাকে আদর করতে লাগল। তারপর এক সময় ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিল। না। কোন রকম কান্নাকাটি করল না সে। লোকটা ভাল করে একবার চারদিক তাকিয়ে দেখল। কোথাও কেউ নেই।

তারপর ছেলেটাকে কাঁধে বসিয়ে নিয়েই লোকটা ছুটতে আরম্ভ

করল। সোজা পথ ধরে কিন্তু গেল না। কারণ তাহলে ধরা পড়ে যেতে পারে। তাই এ গলি সে গলি দিয়ে সে তাকে কাঁধে নিয়ে হন্ত দন্ত ভাবে প্রায় ছুটতে লাগল।

ছেলেধরা লোকটাও কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। আজ নতুন নয়—অনেকদিন থেকেই সে ছেলে ধরে আসছে। এ পর্যন্ত সে অনেক ছেলেই ধরেছে কিন্তু প্রত্যেক বারই সে যে ছেলেকেই ধরতে গেছে, সেই হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠেছে। মুখে কাপড় কিংবা হাত চাপা দিয়ে অতি কষ্টে তাকে ছেলে ধরে নিয়ে যেতে হয়।

আজ কিন্তু এ নিয়মের একেবারে ব্যতিক্রম।

ফুটফুটে এই ছোট্ট ছেলেটা একটুও কাঁদল না। ধরার সময়ও না। এমন কি কাঁধে নিয়ে যখন সে পাড়া ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছে তখনো পর্যন্ত তার এতটুকুও কান্না নেই। যেন কাঁদতেই জানে না। কান্না তো দূরের কথা কেমন যেন একটা খুশী খুশী ভাব ছেলেটার চোখে মুখে।

তাই লোকটা অবাক না হয়ে পারে নি। সে মনে মনে ভাবে, এমন ছেলেকে ধরেও সুখ।

এ গলি সে গলি দিয়ে ওরা অনেকগুলো পাড়া ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে এসেছে।

পথে একজন ছোট্ট ছেলেটাকে দেখে হাসতে হাসতে বলল, কোথায় যাচ্ছো বাছা?

ছেলেটা লোকটার কাঁধে বসেই বলে, বাড়ি যাচ্ছি।

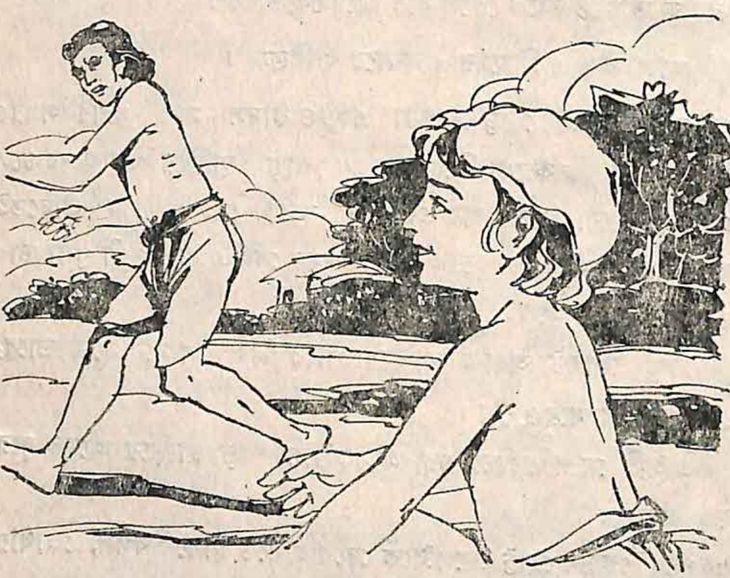
কী বোকা রে বাবা—ছেলেধরা লোকটা মনে মনে হাসে আর

ভাবে, বাড়িই যাচ্ছো বটে! চলো না! কেমন বাড়ি একবার দেখবে চলো বাছাধন!

লোকটা এবার আরো দ্রুত পা চালাতে লাগল।

কত অলিগলি ঘুরে শেষে লোকটা ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় বসে একটু বিশ্রাম করে নেবার মনস্থ করল। একটা বাড়ির সামনে এসে ছেলেটাকে কাঁধ থেকে নামাল সে।

কিন্তু এ কি? এ-ও কি সম্ভব?



ছেলেধরা লোকটা দেখল, যেখান থেকে ছেলেটাকে কিছুক্ষণ আগে ধরে নিয়ে গেছে ঠিক সেইখানেই আবার ফিরে এসেছে। এটা সেই জায়গা।

লোকটা একেবারে হতবাক। সে ভাবে, কেমন করে এটা সম্ভব হল? সে স্বপ্ন দেখছে না তো? ভাল করে চারদিক তাকিয়ে দেখল, হ্যাঁ, এটা তো এই ছেলেটারই বাড়ি। ঐ তো যেখানে বসে ছেলেটা ধুলো মাটি নিয়ে খেলা করছিল, আঁকি বুকি কাটছিল ঐ তো সেই জায়গা। এখনো তো ধুলোর উপর তার দাগ রয়েছে। কিন্তু এত অলিগলি পার হয়ে কত দূরেই না তাকে নিয়ে গিয়েছিল! আবার ঘুরে ফিরে ঠিক সেইখানেই?

লোকটা মনে মনে ভাবে, পথে একবার ছেলেটা বলেছিল, 'বাড়ি যাচ্ছি'। তবে তো ঠিকই বলেছিল সে। এ তো দেখছি সাধারণ ছেলে নয়।

ছেলেধরা লোকটা আর দেরী করল না। ছেলেটাকে নামিয়ে রেখেই সে ছুটে পালিয়ে যায়।

সেদিনের সেই ছোট্ট ছেলেটাই বড় হয়ে নিমাই পণ্ডিত হয়েছিলেন। আরো বড় হয়ে হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব।

১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম ছিল জগন্নাথ মিশ্র এবং মায়ের নাম শচীদেবী। তাঁর আসল নাম ছিল নিমাই। তাঁর গায়ের রং ছিল খুব ফর্সা। তাই তার আর এক নাম রাখা হল গৌরাঙ্গ। ডাক নাম গোরা। তিনি যে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন—ছোট বেলাতেই তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।

তিনি অতি অল্প বয়সেই বিপুল পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন। বহু বড় বড় পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেন।

নবদ্বীপে তিনি টোল প্রতিষ্ঠা করে নিজেই অধ্যাপনা করেছেন।

মাত্র চব্বিশ বছর বয়সেই তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন এবং গৃহত্যাগ করেন। তখন থেকেই তাঁর নাম হল চৈতন্যদেব।

চৈতন্যদেব যে ধর্মের প্রবর্তন করেন তার নাম বৈষ্ণবধর্ম। তিনি জাতিভেদ মানতেন না। তিনি বলতেন ভক্তিতেই মানুষের মুক্তি। বাংলা, উড়িষ্যা, বৃন্দাবন এবং দক্ষিণ ভারতের বহু জায়গায় ঘুরে ঘুরে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। শুধু হিন্দু নয়—অনেক মুসলমানও ছিলেন তাঁর শিষ্য। তাঁর মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে যবন হরিদাস অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। সমাজের অবহেলিত, উপেক্ষিত স্বধর্মী, বিধর্মী, পাপী, পুণ্যবান সবাইকেই ঐক্যের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। তিনি মৃতকল্প হিন্দুসমাজকে প্রেমধর্মে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন। ভারতের সমাজধর্ম এবং সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁর আবির্ভাব এক চিরস্মরণীয় ঘটনা।

মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেব দেহ রক্ষা করেন।

হে মহাজীবন



হাজী মহম্মদ মহসীন একদিন সকালে তাঁর হুগলী শহরের বাড়িতে বসে কোরাণ শরীফ লিখছিলেন। এক মনে লিখে চলেছেন তিনি। কোনদিকেই যেন খেয়াল নেই।

ঠিক তখনই এক ভিখারী এসে তাঁর বাড়ির উঠানে দাঁড়াল। বলল, বাবু, দুটো ভিক্ষে দেবেন?

মহম্মদ মুখ তুললেন না। তখনো লিখেই চলেছেন। ভিখারীর কণ্ঠস্বর তাঁর কানেও পৌঁছয় নি।

ভিখারী কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এক পা দু পা করে আরো একটু এগিয়ে এল। আবার বলল, দুটো ভিক্ষে দেবেন বাবু!

এইবার কলম ছেড়ে মুখ তুলে তাকালেন মহম্মদ। ভিখারী লোকটার দিকে। কিছুক্ষণ তিনি তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। কী যেন নিরীক্ষণ করছেন তিনি।

ভিখারী লোকটা কিন্তু অনেক আশা নিয়ে তাঁর কাছে এসেছে। মহম্মদ মহসীনের দানশীলতার কথা তখন লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রার্থীকে তিনি কোনদিনই বিমুখ করতেন না। বরং আশাতীত ভাবে তাকে দান করতেন।

তাই ভিখারী লোকটার মনেও আজ অনেক আশা। সাধারণ গৃহস্থের মত মহম্মদ নিশ্চয়ই দুটো চাল বা দু একটা পয়সা দিয়ে তাকে বিদায় দেবেন না। অনেক বেশী তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে। হয়ত তিনি এমন জিনিস তাকে দেবেন যে, আর হয়ত কোনদিন তাকে ভিক্ষেই করতে হবে না।

এইসব কত কি ভাবতে লাগলো ভিখারী লোকটা!

মহম্মদ কিন্তু তখনো তার দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি দেখলেন, ভিখারী লোকটার চেহারাটাও বেশ হৃষ্টপুষ্ট। বয়সটা এমন কিছু বেশী নয়। হাতে তার একটা বেশ বড় পিতলের ঘটি। এমন লোকের তো ভিক্ষা করা উচিত নয়। এ তো অনায়াসে খেটে খেতে পারে! তবুও তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ভিক্ষে করো কেন?

কি করব বাবু—লোকটা প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, ভিক্ষে না করলে খাব কি?

বাড়িতে তোমার কে কে আছে?

কেউ নেই বাবু।

তোমার ঘর দোর আছে তো ?

না বাবু, তাও নেই ।

থাকো কোথায় ?

ভিখারী লোকটা জবাব দেয়, গাছতলায় থাকি বাবু । আমার এই ঘটিটা ছাড়া আর কিছু নেই বাবু !

ঘটিটা ছাড়া তোমার আর কিছু নেই ?

না বাবু !

মহম্মদ এবার হাত বাড়িয়ে বললেন, দাও, তোমার ঘটিটাই দাও দিকি ।

সঙ্গে সঙ্গে ভিখারী লোকটা তাঁর হাতে ঘটিটা তুলে দিল । মনে মনে সে কিন্তু একটু যেন আশা ভঙ্গ হল । কারণ আশা ছিল যে, মহম্মদ তাকে অন্য কিছু দেবেন । কিন্তু যখন তিনি ঘটিটা চেয়ে নিলেন হয়ত বড়জোর একঘটি ভর্তি করে চাল দেবেন । তবু ভালো, একঘটি চাল যোগাড় করতে অন্ততঃ দশটা বাড়ি ঘুরতে হত । এখানেই ঘটিটা বোঝাই হয়ে যাবে । সেটাই বা মন্দ কি ?

তুমি একটু অপেক্ষা কর—বলে মহম্মদ মহসীন ঘটিটা নিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন ।

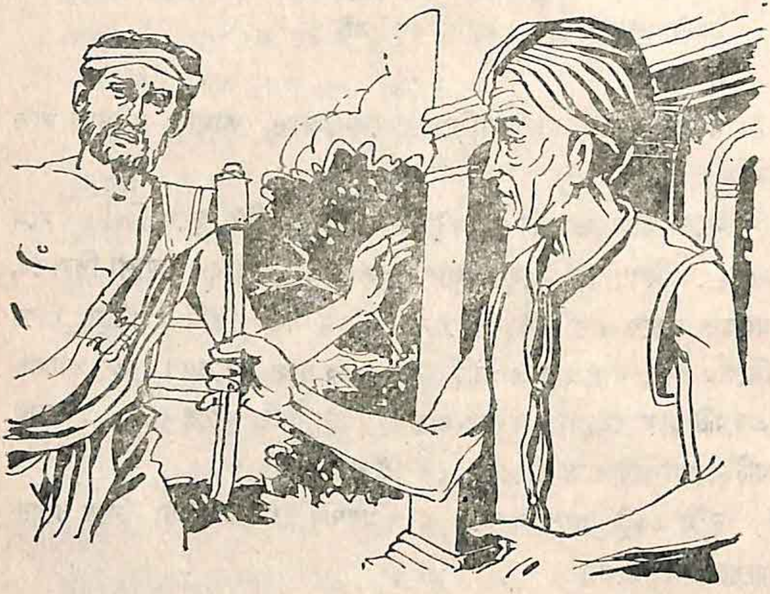
ভিখারী লোকটা অনেকক্ষণ উঠোনেই দাঁড়িয়ে রইল । গৃহস্থ ঘর থেকে আর বারই হন না । কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় ?

অনেকক্ষণ পরে অধৈর্য হয়ে ভিখারী লোকটা ডাকল, বাবু গো ! কোথায় গেলেন ?

কিন্তু ঘর থেকে বাবুর কোন সাড়াই পাওয়া গেল না ।

ঘরে থাকলে তো বাবুর সাড়া পাওয়া যাবে । আসলে মহম্মদ

ঘরের পিছনের দরজা দিয়ে ঘটিটা নিয়ে বাজারে চলে গেছেন। বাজার অবশ্য খুব কাছেই। সেখানে তিনি ঘটিটা বিক্রি করে দিয়ে সেই পয়সায় একটা ভাল দেখে কুড়ুল কিনে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়েই আবার ঘরে ঢুকলেন।



আরো কিছু সময় কেটে গেছে। লোকটা উঠোন থেকে আরো ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করতে লাগল।

এক সময় মহম্মদ মহসীন কুড়ুলখানা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

ভিখারী লোকটা তো অবাক! কুড়ুল দিয়ে কী হবে? ঘটিটাই বা গেল কোথায়?

সে কিছু বলার আগেই মহম্মদ বললেন, তোমার ঘটিটা বিক্রি করে দিয়ে এলাম।

সে কি বাবু ?—লোকটা বলে, আমার ঘটি.........

বাধা দিয়ে মহম্মদ বললেন, তোমার ঘটি বিক্রির পয়সা দিয়ে এই কুড়ুলখানা কিনে নিয়ে এলাম !

লোকটা যেন হতবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল !

মহম্মদ আবার বলতে লাগলেন, দেখ, তোমার স্বাস্থ্য ভাল, বয়সও বেশী নয়। তবে তুমি ভিক্ষে কর কেন ? তুমি তো বেশ খেটে খেতে পার। তোমাকে আজ তাই ঘটির বদলে কুড়ুল দিলাম। আজ থেকে আর ভিক্ষে কোর না। খেটে খাও গে যাও।

১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী শহরে হাজী মহম্মদ মহসীন জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হাজী ফয়জুল্লা।

মহম্মদের এক ভগিনী মন্নুজান অগাধ সম্পত্তির অধিকারিণী ছিলেন। ভ্রাতা মহম্মদ মহসীনকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ভাই-এর নামে উইল করে দেন।

বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েও তিনি কোনরূপ ভোগ বিলাসে লিপ্ত ছিলেন না। সামান্য ফকিরের মতই তিনি জীবন যাপন করতেন। সারাদিন ধর্মালোচনা নিয়েই থাকতেন। নিজের হাতে তিনি একখানি কোরাণ শরীফও লিখেছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নি, চিরকুমার ছিলেন !

মহম্মদ মহসীন অকাতরে দরিদ্র ও দুঃখীকে দান করতেন। তিনি নামের কাঙাল ছিলেন না ! তাই তিনি অধিকাংশ দান করতেন

গোপনে। রাত্রে ছদ্মবেশে তিনি লোকালয়ে ঘুরে বেড়াতেন কোথায় কার অভাব আছে তা জানার জন্যে। নানা ভাবে তিনি সবাইকে সাহায্য করতেন। দুঃখীর দুঃখ দেখলে তিনি আর স্থির থাকতে পারতেন না।

অল্প বয়সেই তিনি আরবি ও ফারসী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মহসীন দেশ ভ্রমণে বার হন। আরব, পারস্য প্রভৃতি অনেক দেশ ভ্রমণ করেন। মক্কা, মদিনা দর্শন করে তিনি 'হাজী' উপাধি গ্রহণ করেন।

দয়া, দাক্ষিণ্য, মানবপ্রীতি প্রভৃতি গুণের জন্য মহম্মদ মহসীন অমর হয়ে আছেন।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর নয় লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি নানা জনহিতকর কাজে ও মুসলমানদের শিক্ষা প্রসারের জন্য দান করে যান। তাঁর দান করা অর্থে বাংলার নানাস্থানে মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। স্কুল কলেজের মেধাবী মুসলমান ছাত্রদের জন্য মহসীন বৃত্তির ব্যবস্থা হয়। হুগলীর ইমামবারা, মহম্মদ মহসীন কলেজ তাঁরই অক্ষয় কীর্তি।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে এই দানবীর পরলোক গমন করেন।

হে মহাজীবন



অনেকদিন আগেকার ঘটনা। তখন ইংরেজ রাজত্ব।

এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক নৌকায় করে ভাগলপুরের ঘাটে এসে ভিড়লেন। এখানে তাঁর বিশেষ কোন কাজ ছিল। কয়েকদিনের জন্যে তাঁকে এখানে থাকতে হবে।

ভদ্রলোক কিন্তু নৌকো থেকে তখনই নামলেন না। তাঁরই এক ভৃত্যকে পাঠালেন শহরে একটি ভাল ঘর ভাড়া করার জন্যে। লোকটা ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি নৌকার মধ্যে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে ভৃত্য লোকটা ফিরে এল।

ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হে! শহরে ঘর পাওয়া গেল?

পেয়েছি বাবু—লোকটা জবাব দেয়, বেশ ভাল ঘরই পেয়েছি।

ভাল ঘর?

হ্যাঁ বাবু।

কাছেই তো?

লোকটা জবাব দেয়, খুব বেশী দূর নয়, এক রকম কাছেই বলা চলে।

বেশ—ভদ্রলোক এবার বললেন, এবার একটা পাল্কি আনো। আমি যাব।

লোকটা আবার ছুটলো পাল্কি ভাড়া করে আনতে। ঘাটের কাছেই পাল্কি ভাড়া পাওয়া যেত। তারই একটা ভাড়া করে নিয়ে এল লোকটা।

ভদ্রলোক এবার নৌকা থেকে নেমে পাল্কিতে ওঠার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

ভদ্রলোক যেমন লম্বা তেমনই চওড়া। যাকে বলে দশাসই চেহারা। মাথায় আবার বিরাট একটা পাগড়ি। খুব সহজেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পাল্কিতে চড়ে ভদ্রলোক রাজপথ ধরে চলেছেন। পাল্কির আগে আগে হেঁটে চলেছে সেই ভৃত্য।

কিছুদূর আসার পর রাজপথের ধারে এক জায়গায় জেলার শাসনকর্তা একটা ইটের পাঁজা তদারক করছিলেন। এই জেলাশাসক ছিলেন ইংরেজ। নাম স্যার ফ্রেডারিক হ্যামিলটন।

ইংরেজরা তখন আমাদের দেশের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করে আছে। বণিকের মানদণ্ড হাতে নিয়ে এসে এখন তারা রাজদণ্ড লাভ করেছে। আমাদের দেশে এসে তারা তখন আমাদেরই উপর প্রভুত্ব চালাতো। তারাই নিয়ম করে দিয়েছিল যে, কোন উচ্চ রাজ-কর্মচারীর সামনে দিয়ে কোন ভারতীয় পাল্কি কিংবা ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারবে না। এমন কি ছাতা মাথায় দিয়ে যাওয়াও ছিল প্রায় নিষিদ্ধ। তাই কোন উচ্চ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত কোন ইংরেজ সরকারী কর্মচারীর সম্মুখীন হলেই ভারতীয়দের তাঁর সামনের পথটুকু পাল্কি বা ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যেতে হত। কাঠফাটা রৌদ্রেও মাথার ছাতাটা খুলতে হত। কি চমৎকার ব্যবস্থা!

যাই হোক ইঁটের পাঁজা তদারকি করতে করতে স্যার হ্যামিলটনের কানে এল পাল্কির বেয়ারাদের হেঁইও! হেঁইও!! রব।

ভ্রূ দুটো একটু কুঁচকে সামনের রাস্তাটার দিকে তাকালেন তিনি। মনে মনে ভাবলেন, কে আসছে এখন ?

ইট খোলার জনৈক কর্মচারী সাহেবের কাছে এসে বলল, স্যার, কালা আদ্‌মী।

কালা আদ্‌মী ? —হ্যামিলটন বললেন, মানে ভারতীয় ?

হ্যাঁ স্যার।

কিন্তু কোথায় ?

পাল্কিতে।

পাল্কিতে ?

হ্যাঁ স্যার। পাল্কির হেঁইও হেঁইও শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না ?

হ্যামিলটন বললেন, তা তো শুনতে পাচ্ছি কিন্তু........

কথা শেষ না হতেই পাল্কিটা সাহেবের নজরে পড়ল।

কর্মচারী লোকটা যেন চিৎকার করে বলে উঠল, ঐ যে স্যার! পাল্কিটা আসছে।

পাল্কিটা তখন হ্যামিলটনের সামনের রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে। ইংরেজ শাসক দাঁড়িয়ে আছেন কিন্তু তবুও পাল্কির ভারতীয় আরোহী নামল না দেখে হ্যামিলটন নিজেই পাল্কি থামানোর নির্দেশ দিলেন।

পাল্কির আরোহী ভদ্রলোকের আগে আগে যে লোকটা হেঁটে যাচ্ছিল, সে পাল্কির দরজার কাছে ছুটে এসে বলল, বাবু! সাহেব।

সাহেব? কোথায়?

লোকটা জবাব দিল, ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

প্রায় ধমকের সুরে ভদ্রলোক তাকে বললেন, থাকুক! তাতে হয়েছে কী?

লোকটা বলে, উনি পাল্কি থামাতে বলছেন যে!

পাল্কি থামাতে বলছেন?

হ্যাঁ বাবু—ভৃত্য লোকটা বলল, হাত উঁচু করে উনি পাল্কি থামাতে বলছেন।

না—যেন গর্জন করে ভদ্রলোক পাল্কির ভিতর থেকেই বললেন, পাল্কি থামবে না।

থামবে না?

না।

কিন্তু—আমতা আমতা করে লোকটা বলল, উনি যে এখনও হাত উঁচু করছেন!

তা হোক—ভদ্রলোক বললেন, আমার হুকুম, পাল্কি থামবে না। যে সাহেবই হাত উচু করুক, এগিয়ে চলো।

পাল্কি থামল না। এগিয়ে চলল।

ওদিকে সাহেবও রেগে গিয়ে হুকুম দিলেন পাল্কি থামাতে।

পাল্কি তবুও থামল না। এগিয়ে চলল।

হ্যামিল্‌টন সাহেব যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন পাল্কিটা এবার সেই জায়গাটা অতিক্রম করল।

হ্যামিল্‌টন এবার আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তখন ঐ ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেতাই ভাবে গালিগালাজ করতে লাগলেন।



সাহেবের মুখে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ শুনে এবার ভদ্রলোক

চুপ করে থাকতে পারলেন না। বড়ই অসহ্য মনে হল তাঁর। এবার তিনি পাল্কি থেকে নামলেন। এগিয়ে গেলেন হ্যামিলটনের দিকে।

হ্যামিলটন সাহেব ভদ্রলোকের পেশীবহুল চেহারা দেখে সম্ভবত একটু ভয় পেয়েছিলেন।

সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক বললেন, শিক্ষিত ইংরেজদের এতদিন ভদ্র বলেই জানতাম। কিন্তু তোমার মত একজন ইংরেজের মুখে এ হেন অভদ্রজনোচিত কথা শুনে আমার সে ধারণা ভেঙ্গে গেল।

হ্যামিল্টন ভদ্রলোককে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ভদ্রলোক তক্ষুণি বললেন, তোমার সঙ্গে কথা বলতেও আমি আর প্রয়োজন বোধ করি না।

কথাগুলি বলেই আবার তিনি পাল্কিতে গিয়ে উঠলেন।

পাল্কি আবার চলতে শুরু করল। বেয়ারাদের কণ্ঠে আবার শোনা যেতে লাগল, হেঁইও রে হেঁইও।

পাল্কির আরোহী ভদ্রলোকের নাম রাজা রামমোহন রায়। পরে তিনি জেলা শাসক হ্যামিল্টনের এই আচরণের জন্যে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তখনকার গভর্ণর লর্ড মিণ্টোর কাছে একখানি পত্র পাঠিয়েছিলেন। ঐ পত্রে তিনি আরো লিখেছিলেন যে, উচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোন সরকারী ইংরেজ কর্মচারীর সামনে দিয়ে কোন ভারতীয়-কে ঘোড়া বা পাল্কি থেকে নেমে যেতে হবে, এমন কি মাথার ছাতাটা পর্যন্ত খুলে নিতে হবে—এমন জোর করে সম্মান আদায় করার প্রচেষ্টা থেকে যেন ইংরেজরা বিরত থাকেন।

লর্ড মিণ্টো পরে রাজা রামমোহনের যৌক্তিকতা স্বীকার করে

নিয়েছিলেন এবং জেলা শাসক হ্যামিলটনের অভদ্র আচরণের জন্যে পত্রোত্তরে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করেছিলেন।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। মাতা তারিণীদেবীও ছিলেন ধর্মপরায়ণা হিন্দু রমণী।

শৈশব থেকেই রামমোহন ছিলেন অসাধারণ মেধাবী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তিনি কিছুকাল কাশীতে অবস্থান করেন। তাঁর জ্ঞান পিপাসা ছিল অদম্য। ক্রমে তিনি ইংরাজী, ফরাসী, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। তা'ছাড়া তিব্বতী ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্রেও তিনি বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

রামমোহন ছিলেন একেশ্বরবাদী। এই একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্যেই তাঁর পিতার সঙ্গে মত বিরোধ দেখা দেয় এবং তিনি জীবিকার্জনের জন্যে গৃহত্যাগ করেন। উত্তরবঙ্গের রংপুরে তিনি ইংরেজ সরকারের অধীনে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে স্থায়ীভাবে কলকাতায় বাস করতে থাকেন। কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি নানাভাবে সমাজের নানা কুসংস্কার দূরীকরণে আত্মনিয়োগ করেন।

পরাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করেও রামমোহন ছিলেন স্বাধীনতার পূজারী। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত মানবপ্রেমিক এবং স্বদেশহিতৈষী। সতীদাহ প্রথা দূরীকরণের জন্যে তাঁর একক সংগ্রাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এজন্য তিনি গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন।

রামমোহন ছিলেন আধুনিক ভারতের অগ্র পথিক। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ভারত পথিক বলে অভিহিত করেছেন।

পরাধীন্ দেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে তৎকালীন দিল্লীর সম্রাট তাঁকে রাজা উপাধি প্রদান করেন এবং ইংল্যাণ্ডে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। দিল্লীর সম্রাটের অনুরোধ রক্ষা করতে রাজা রামমোহন ইংল্যাণ্ড গমন করেন। সেখানে ব্রিষ্টল শহরে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

হে মহাজীবন



তখন কলকাতা হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন একজন ইউরোপীয়ান। নাম কার সাহেব। আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ।

একবার কী যেন একটা প্রয়োজনে বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। যখন তিনি কার সাহেবের ঘরে ঢুকলেন তখন দেখলেন যে, সাহেব তাঁর পা দু'খানা টেবিলের উপর তুলে দিয়ে চেয়ারে প্রায় আধশোয়া অবস্থায় বসে আছেন!

বিদ্যাসাগর তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

কার সাহেব শুধু একবার তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। তাঁকে কিন্তু কোন রকম অভ্যর্থনা জানালেন না। টেবিলের উপর থেকে তাঁর পা দু'খানাও নামালেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েই রইলেন।

তখন কার সাহেব তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনার কী দরকার বলুন।

বিদ্যাসাগর তাঁর প্রয়োজনীয় কথাটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বলেই কার সাহেবের ঘর থেকে বাইরে চলে এলেন।

কার সাহেবের এ হেন আচরণের জন্য তিনি মনে মনে খুবই রেগে গেলেন। ভাবতে লাগলেন, সাহেবের এই অশোভন আচরণের যোগ্য প্রত্যুত্তর তাঁকে দিতেই হবে।

অবশেষে একদিন তাঁর কাছে সেই সুযোগও এসে গেল।

ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে কার সাহেবই একদিন এলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে। সেদিন ছিল কার সাহেবেরই বিশেষ প্রয়োজন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন কলেজে তাঁর নির্দিষ্ট ঘরটিতে বসে কাগজ-পত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। দারোয়ান এসে তাঁকে জানাল যে, হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল কার সাহেব এসেছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ভ্রূ কুঁচকে বললেন, কার সাহেব?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন?

দারোয়ান জবাব দেয়, সাহেব আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

তাই নাকি?

হ্যাঁ—দারোয়ান বলল, সাহেব বলছেন যে তাঁর খুব জরুরী দরকার। সাহেবকে এখানে নিয়ে আসব?

বিদ্যাসাগর মহাশয় সে কথার কোন জবাব দিলেন না। মনে মনে তিনি খুবই খুশি হলেন। ভাবলেন, এইবার সেই ঘটনার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবার সময় এসেছে। এ সুযোগ ছাড়া হবে না।

দারোয়ান আবার জিজ্ঞাসা করল, সাহেবকে কি এখানে নিয়ে আসব? উনি বাইরে অপেক্ষা করছেন।

সাহেবকে নিয়ে আসবে?—একটু যেন অন্যমনস্ক ভাবে বিদ্যাসাগর বললেন, না, না, একটু দাঁড়াও।

কথা বলেই বিদ্যাসাগর মহাশয় টেবিলের সব কাগজ পত্রগুলো সরিয়ে ফেললেন। টেবিলের নীচে রাখা চটি জুতো দুটো পায়ে গলিয়ে নিলেন। তারপর সেই চটিজুতো সমেত পা দু'খানা টেবিলের উপর তুলে দিয়ে ঠিক কার সাহেবের মতই চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রইলেন।

দারোয়ান তাঁর কাণ্ড কারখানা দেখে বোধ হয় বেশ কিছুটা অবাক হয়ে গিয়েছিল। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে মুখ টিপে হাসতে লাগল।

এইবার বিদ্যাসাগর মহাশয় দারোয়ানকে বললেন, এখন তুমি সাহেবকে আমার ঘরে নিয়ে আসতে পার।

দারোয়ান হাসতে হাসতে চলে গেল।

তক্ষুণি কার সাহেব বিদ্যাসাগরের ঘরে ঢুকলেন। বিদ্যাসাগরও আজ সাহেবকে কোন রকম অভ্যর্থনা করলেন না। তাঁর চটিজুতো

সমেত পা দুখানা তখনো ঠিক টেবিলের উপর। চেয়ারের একটা হাতলে ভর দিয়ে আধশোয়া ভাবেই তিনি বললেন, এইবার বলুন কী দরকার আপনার ?



কার সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তাঁর কথাগুলো বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিদ্যাসাগরের ব্যবহারে কার সাহেবও আজ ভীষণ রেগে গেলেন। পরে কলেজসমূহের উর্ধ্বতন কর্মচারী ময়েট সাহেবের কাছে তিনি এই আচরণের জন্যে নালিশ জানালেন। ময়েট সাহেবও বিদ্যাসাগরের কাছে এর জন্যে কৈফিয়ৎ চাইলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এর উত্তরে ময়েট সাহেবকে জানালেন, এইরকম

অভ্যর্থনা কি খুব দোষের? আমি তো কার সাহেবের কাছেই এই রকম অভ্যর্থনা জানাতে শিখেছি। আমি ভেবেছিলাম সুসভ্য ইউরোপীয়ানরা বুঝি এইভাবেই শিষ্টাচার প্রদর্শন করে থাকেন। এইভাবে শিষ্টাচার প্রদর্শন করাটা যদি খুব দোষের হয় তবে সে দোষ কার সাহেবের—আমার নয়।

মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; মাতার নাম ভগবতী দেবী। ঈশ্বরচন্দ্র আজীবন অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পিতা মাতার সেবা করে গেছেন। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই ছেলেবেলায় তাঁকে অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল।

গ্রাম্য পাঠশালায় ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষা আরম্ভ হয়। বাল্যকালেই তাঁর অসাধারণ মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষা শেষ করে তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। তখন তাঁকে নিজের হাতে রান্না করে খেয়ে কলেজে পড়তে হত। ঘরে আলোর অভাবে রাস্তার ল্যাম্প পোষ্টের নীচে দাঁড়িয়ে পড়া তৈরী করতেন। ছাত্র জীবনটা তাঁর দরিদ্রতার সঙ্গে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কেটে গেছে। তবুও তিনি প্রতি বৎসর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করতেন।

সংস্কৃত কলেজের সব কটি পরীক্ষাই সসম্মানে উত্তীর্ণ হবার পর তৎকালীন পণ্ডিতসভা তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করলেন।

কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

এর কিছুদিন পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। অনেকদিন এই পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর অবশেষে বিদ্যালয়-সমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত হন।

শিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্রের অক্লান্ত প্রচেষ্টার কোন তুলনা নেই। আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রচলন কেবল তাঁর প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছিল। তিনি বীরসিংহ গ্রামে নিজের মায়ের নামে 'ভগবতী বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতার মেট্রোপলিটন কলেজ—যার বর্তমান নাম বিদ্যাসাগর কলেজ—তাও তাঁরই প্রতিষ্ঠিত।

ছোটদের পাঠ্য পুস্তকের অভাবের কথা স্মরণ করে তিনি রচনা করলেন বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, আখ্যান মঞ্জরী।

বাংলা গদ্য সাহিত্য তাঁর হাতেই প্রথম শোভন রূপ লাভ করে। তাই তাঁকে বলা হয় বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক। তাঁর রচিত সীতার বনবাস, শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় গ্রন্থ হয়ে আছে।

নিজে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন বলেই বোধ হয় দরিদ্রদের দুঃখে তিনি সব চেয়ে বেশী দুঃখ অনুভব করতেন। তাই তাঁকে সবাই বলত 'দয়ার সাগর'। মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর তাঁর মায়ের আদেশে একবার শীতের দিনে গ্রামের সবাইকে কম্বল দান করেছিলেন। গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, এমন কি বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করে তাদের সমস্ত খরচ তিনি নিজেই বহন করতেন।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে এই মহামানবের জীবন দীপ নিভে যায়।

হে মহাজীবন



না। ছেলেটার বুঝি আর পড়াই হয় না। এক মাস দু'মাস করে তার তিন মাসের স্কুলের মাইনে বাকি পড়ে গেছে।

মাইনের জন্যে স্কুল কর্তৃ-পক্ষের তাগাদারও অন্ত নেই। কিন্তু কিছুতেই ছেলেটি তার মাইনে দিতে পারে না। একে একে তিন মাসের মাইনে বাকি পড়াতে টাকার অঙ্কটাও বেশ ভারী হয়ে গেছে। কষ্টে স্বষ্টে এতদিন যদিও বা মাইনে দিয়ে এসেছে কিন্তু আর বুঝি পারে না। পারবেই বা কোত্থেকে? ছেলেটা যে অত্যন্ত গরীব।

এমনি করে আরো একটা মাস কেটে গেল।

এবার চার মাসের মাইনে বাকি পড়ল। স্কুল কর্তৃপক্ষের আবার তাড়া, কই? কি হল? হয় চার মাসের মাইনে শোধ করে দাও আর তা না হয় স্কুল ছাড়ো।

স্কুল ছাড়তে হবে? —ছেলেটা মনে মনে ভাবে, আর তা হলে পড়তে পারব না?

ছেলেটা অনেক ভাবল। কিন্তু ভেবে আর কী হবে? কতটুকুই বা তার সাধ্য? তাই মন স্থির করে ফেলল। স্কুল কর্তৃপক্ষকে সে জানিয়ে দিল, আমাদের আর্থিক অবস্থা খুবই অসচ্ছল। চার মাসের মাইনে একসঙ্গে দেওয়া আমার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই স্কুলই ছেড়ে দেব।

কথাটা কানে গেল আর এক সহপাঠীর। ছেলেটা ছিল খুব বড় লোকের ছেলে। আট বেহারার পাল্কিতে চড়ে সে রোজ স্কুলে আসে পড়তে। পোশাক পরিচ্ছদেও ছেলেটা যেন একেবারে সাহেব। সাহেবিয়ানা তার মুখে মুখেও। কথায় কথায় ইংরেজী। ক্লাসের ছেলেরা তার নাম দিয়েছিল সাহেব।

যাই হোক গরীব ছেলেটার স্কুল ছেড়ে দেবার কথাটা ঐ সাহেব ছেলেটার কানে গেল। একটা ছেলে স্কুল ছেড়ে চলে যাবে শুনে সাহেব ছেলেটা তার কাছে গেল। বলল, তোমার কি হয়েছে ভাই?

গরীব ছেলেটা একটু সলজ্জ চোখে তার দিকে তাকাল। বলল, আমার? কি হবে আবার? সাহেব ছেলেটা এবার তার প্যাণ্টের পকেটে দুটো হাত ঢুকিয়ে দিয়ে একটু যেন ভারিক্কি চালে দাঁড়িয়ে বলল, কিছু হয় নি?

কই না তো।

তুমি নাকি স্কুল ছেড়ে চলে যাচ্ছ ?

ছেলেটা এবার মাথা হেঁট করে চাপা একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিল, হ্যাঁ।

কিন্তু কেন ?

ছেলেটা আমতা আমতা করে বলে, চার মাসের মাইনে বাকি পড়েছে ; তাই স্কুল ছেড়ে দিতে হবে।

এইজন্যে ?—সাহেব ছেলেটা বলল, না, তোমার স্কুল ছাড়া হবে না। তুমি পড়াশুনো করবে।



ওর কথা শুনে ছেলেটা মৃদু হাসল। বলল, পড়াশুনো করব ?

হ্যাঁ।

আবার হাসল ছেলেটা। বলল, তুমি জানো না আমাদের সংসারের অবস্থা। তাই এমন কথা বলছ।

আমি ঠিকই বলছি—সাহেব ছেলেটা বলল, তোমার স্কুলের মাইনে বাকি পড়েছে তো? তাই তো তুমি স্কুল ছেড়ে চলে যাচ্ছ? আমি তোমার স্কুলের চার মাসের মাইনে দিয়ে দেব।

মাথা নেড়ে ছেলেটা এবার বলল, উঁহু, তাতে কিছু লাভ হবে না।

কেন?

চার মাসের মাইনে দিলেও আবার তো সেই মাইনে বাকি পড়বে।

না বাকি পড়বে না—সাহেব ছেলেটা বলে, আমি যতদিন এই স্কুলে থাকব ততদিন প্রতিমাসে তোমার স্কুলের মাইনেটা আমিই দেব।

ছেলেটা কিছুক্ষণ বিহ্বলের মত তার সহপাঠী সাহেব ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সেদিনের এই সাহেব ছেলেটাই ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন দত্তের জন্ম হয়। তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত কজন প্রতিপত্তিশালী জমিদার ছিলেন। মধুসূদনের মাতার নাম ছিল হ্নবী দেবী। মায়ের কাছে শোনা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর মধ্য দিয়ে দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হন।

গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করে তিনি কলকাতার খিদিরপুর গ্রামার স্কুলে ভর্তি হলেন। এখানেই ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ল্যাটিন ভাষাতেও প্রাথমিক ভাবে পরিচয় লাভ করেন। তখন থেকে অল্প বিস্তর অ-হিন্দু প্রভাব তাঁর মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। তিনি

ইংরেজী ভাষায় কাব্যচর্চা শুরু করলেন। পারিবারিক বহু বাধা বিপত্তি লঙ্ঘন করে অবশেষে তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা ও চর্চায় মধুসূদন আত্মনিয়োগ করলেন। এতদিন তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন, কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁকে ঐ কলেজ পরিত্যাগ করতে হল। ভর্তি হলেন শিবপুরের বিশপ্‌স কলেজে। তাঁর মর্মাহত পিতা সমাজের নির্দেশে বিধর্মী পুত্রকে ত্যাগ করলেও পুত্রের শিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতেন।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দুটি ইংরাজী কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বন্ধু-দের পরামর্শে মধুসূদন ভাগ্যান্বেষণে মাদ্রাজ যাত্রা করেন। সেখানে এক অনাথ বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষকের পদ লাভ করেন।

কাউন্সিল অফ এডুকেশানের সভাপতি বেথুন সাহেব মধুসূদনের ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে খুবই প্রশংসা করেন, কিন্তু তাঁর প্রতিভাকে মাতৃভাষার অনুশীলনের পরামর্শ দেন।

বেথুন সাহেবের এই পরামর্শেই যেন মধুসূদনের আত্ম চেতনা ফিরে আসে এবং তখন থেকেই তিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্য সেবায় ব্রতী হন। তারপর সৃষ্টি হল তাঁর কাব্য ও নাটক রত্নাবলী, মেঘনাদ বধ, কৃষ্ণকুমারী, পদ্মাবতী প্রভৃতি। তিনি ছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক।

মধুসূদনের জীবন ছিল দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যে পূর্ণ। কিন্তু সারাটা জীবনই তিনি অসীম মনোবলে নিরন্তর সংগ্রাম করে গেছেন।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের মৃত্যু হয়।

হে মহাজীবন



হুগলী জেলার একটি গ্রাম। নাম কামারপুকুর। গ্রামের ছেলেরা সবাই মিলে যাত্রার আয়োজন করেছে।

ছেলেরা নিজেরাই অভিনয় করবে। ছেলেদের এই অভিনয়ে গ্রামের প্রবীণদেরও বেশ উৎসাহ আছে।

সবাই মিলে ঠিক করল শিবরাত্রির দিন অভিনয় হবে। অনেকদিন ধরে যাত্রার রিহার্সাল দেওয়া হল।

যে নাটকখানির ওরা অভিনয় করবে তাতে আবার শিবেরও ভূমিকা আছে।

শিবরাত্রির আর বেশীদিন দেরীও নেই। মাত্র কয়েকটা দিন বাকি।

এদিকে শিবের ভূমিকায় যে ছেলেটি অভিনয় করবে সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল।

ছেলেরা এতে খুবই অসুবিধায় পড়ল! এখন মুখোমুখি সময়; কি হবে? কে অভিনয় করবে?

ছেলেদের মধ্যে একজন বলল, এখন কি করা যায়? কাকে শিবের পার্ট দেওয়া যাবে?

তাই তো ভাবছি—আর একজন বলল, তা'ছাড়া শিবরাত্রিও তো এসে গেল প্রায়।

যাত্রার নাটক পরিচালনার ভার যাঁর উপর ছিল তিনি তো মাথা চুলকে বললেন, এই ক' দিনের মধ্যে কেই বা পার্ট মুখস্থ করে শিব সাজবে?

সকলেরই এক চিন্তা। শিব ছাড়া তো এ নাটক হবার উপায়ও নেই।

অন্য একজন হঠাৎ প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, কুছ পরোয়া নেই। আমি পেয়ে গেছি।

সবাই তাকাল তার দিকে। একজন বলল, পেয়ে গেছিস?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, পেয়ে গেছি।

কী পেয়ে গেছিস?

আর ভাবনা নেই—ছেলেটা বলে, একজনকে দিয়ে এ কাজে উদ্ধার পাওয়া যাবে।

সকলেই প্রায় একসঙ্গে বলে ওঠে, কে সে?

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে ছেলেটা উৎফুল্ল হয়ে মাথায় একটা হাত রেখে বলে, ইস্, এতক্ষণ আমার ওর কথা মনেই ছিল না। নয়ত……

বাধাদিয়ে আর একজন বলল, তুই কার কথা বলছিস রে ?

কে আবার ? —ছেলেটা জবাব দেয়, ও পাড়ার ক্ষুদিরাম চাটুয্যের ছেলে গদাধর।

গদাধর ?

হ্যাঁ।

সেই পাগলা গদাধরের কথা বলছিস তো ?

হ্যাঁ রে হ্যাঁ।

ও কি পারবে ?

পারবে না মানে ? —ছেলেটা বলে, তোরা দেখিস ও ঠিক ম্যানেজ করে নেবে।

আর একটা ছেলে এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। এবারে সে বলল, কথাটা কিন্তু বলেছিস ঠিক। গদাধরের বেশ নাদুস নুদুস চেহারা। শিব ওকে মানাবেও ভালো।

তারপর শিবরাত্রি এসে গেল।

এসে গেল যাত্রা অভিনয়ের দিন।

সন্ধ্যা হতেই সাজ সাজ রব। গ্রামের সবাই ভীড় করেছে। যাত্রা আরম্ভ হবার অনেক আগে থেকেই যে যার জায়গা নিয়ে বসেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যাত্রা আরম্ভ হল।

শিবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল সেই গদাধর।

সারা গায়ে ছাই মাখা, হাতে ত্রিশূল। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। মাথায় জট।

যাত্রার আসরে শিবকে দেখে সবাই যেন চমকে উঠল। এ যে একেবারে সত্যিকারের শিব।

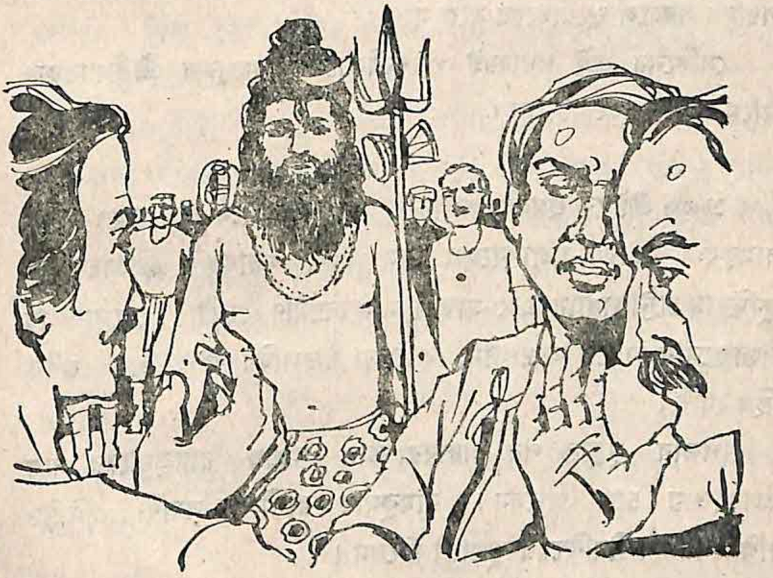
এ তো অভিনয় নয়। যেন স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব আজ অবতীর্ণ হয়েছেন কামারপুকুরের মাটিতে।

মেয়েরা আনন্দে আর ভক্তিতে চারদিক থেকে শঙ্খধ্বনি করে উঠল।

ওদিকে আর এক কাণ্ড।

শিব একেবারে পাথরের মূর্তির মত নিথর। তার মুখে কোন কথা নেই। তখন সে একেবারে অন্য জগতে। হাত, পা একেবারে অসাড়। চেতনাটুকুও তার নেই। গভীর ধ্যানমগ্নতায় সে তখন আচ্ছন্ন।

না। কিছুতেই গদাধরকে জাগানো গেল না।



এদিকে অগণিত দর্শকদের সবাই অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। তারা ভাবল এ কি হল ?'

যাত্রার পরিচালক মশাই পর্যন্ত ছুটে গেলেন মঞ্চে। তিনি দেখলেন, গদাধরের চেতনা শক্তি একেবারেই নেই। তাকে দিয়ে আজ আর অভিনয় হবে না।

তখন বাধ্য হয়ে গদাধরকে সকলে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে গেল।

যাত্রার পালা আর হল না। শিব ছাড়া এ পালার অভিনয় কক্ষণো হতে পারে না।

সারা রাত গদাধরের চেতনা ফেরে নি। তার চেতনা ফিরল পরদিন সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

সেদিনের এই গদাধরই পরবর্তীকালে পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন রামকৃষ্ণ। তাঁর বাল্যকালের নাম ছিল গদাধর। পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম চন্দ্রমণি দেবী। ছেলেবেলায় পড়াশুনোর চাইতে যাত্রাগান, কথকতা ইত্যাদির উপর তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী।

পিতার মৃত্যুর পর গদাধর তাঁর অগ্রজ রামকুমারের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন। রামকুমার রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের পূজারী ছিলেন।

পরে গদাধরই দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের পূজারী নিযুক্ত হন।

তাঁর পূজা করার রীতিই ছিল আলাদা। তিনি পূজা করতে করতে মা কালীর মুখের দিকে আর পায়ের দিকে চেয়ে থাকতেন। চোখ দিয়ে জল পড়ত। 'মা, মা, দেখা দে' বলে কেঁদে ফেলতেন। মাকে আকুল ভাবে ডাকাই ছিল তাঁর পূজার মন্ত্র।

জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সারদামনির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

বিয়ের পরে আবার তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। এই সময় তিনি এক ভৈরবীর কাছে তন্ত্র মতে সাধন ভজন করতে শেখেন। পরে মহাসাধক তোতাপুরী তাঁকে বৈদান্তিক সাধনায় অনুপ্রেরণা দেন। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে তোতাপুরীর সময় লেগেছিল প্রায় ৪০ বৎসর। কিন্তু তোতাপুরীর কাছে মাত্র একদিনেই গদাধর তাতে সিদ্ধিলাভ করেন।

তোতাপুরীই গদাধরের নাম দিলেন পরমহংস। পরে তিনি মুসলমান ফকিরের কাছে ইসলাম মতে এবং খ্রীষ্টান মতেও সাধন ভজন করেছেন। তিনি বুঝেছিলেন সব ধর্মেরই মূল কথা ঈশ্বর দর্শন। পথ আলাদা আলাদা, কিন্তু গন্তব্য এক।

সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর তাঁর কাছে বহু শিষ্যের আবির্ভাব হতে থাকে। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের নাম ভূবন বিখ্যাত।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ইহলোক ত্যাগ করেন।

হে মহাজীবন



সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তখন কলকাতার কলেজ স্ট্রীটের একটা বাড়িতে থাকতেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন ছাত্র একদিন তাঁকে দেখার জন্যে কলেজ স্ট্রীটে তাঁর বাড়ি খুঁজতে লাগলেন। শুধু দেখার জন্যে নয়, তাঁদের আরো উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য সম্রাটের সঙ্গে সাহিত্য সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা। ওঁরা দুজনেই ছিলেন আবার সাহিত্যের ছাত্র।

দুই তরুণ অনেক খোঁজা-খুঁজির পর একটা বাড়ির দরজার কাছে এসে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখতে পেলেন। ভাবলেন তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন। কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোক

খুব চেঁচামেচি করে কাকে যেন বকছেন। ঠিক এই সময় তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে না ভেবে তাঁরা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েই রইলেন। ভদ্রলোকের পরনে ধুতি, খালি গা। গলায় পৈতে দেখে সহজেই বুঝা যায় যে, তিনি ব্রাহ্মণ।

ভদ্রলোক চেঁচামেচি করতে করতেই এক সময় ওদের দিকে ফিরে তাকালেন।

তরুণদের মধ্যে একজন সুযোগ বুঝে ধীরে ধীরে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন। বললেন, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

ভদ্রলোক তক্ষুণি জবাব দিলেন, স্বচ্ছন্দে।

তরুণদ্বয় বুঝতে পারলেন ইনি নিশ্চয়ই এই বাড়ির কর্তা।

এবার দুজনেই তাঁর আরো কাছে এগিয়ে এলেন। একজন বললেন, আপনি কি বলতে পারেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কোন বাড়িতে থাকেন?

বৃদ্ধ ভদ্রলোক কিছুক্ষণ তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, বঙ্কিমচন্দ্র ?

হ্যাঁ।

তোমরা কোত্থেকে আসছ?

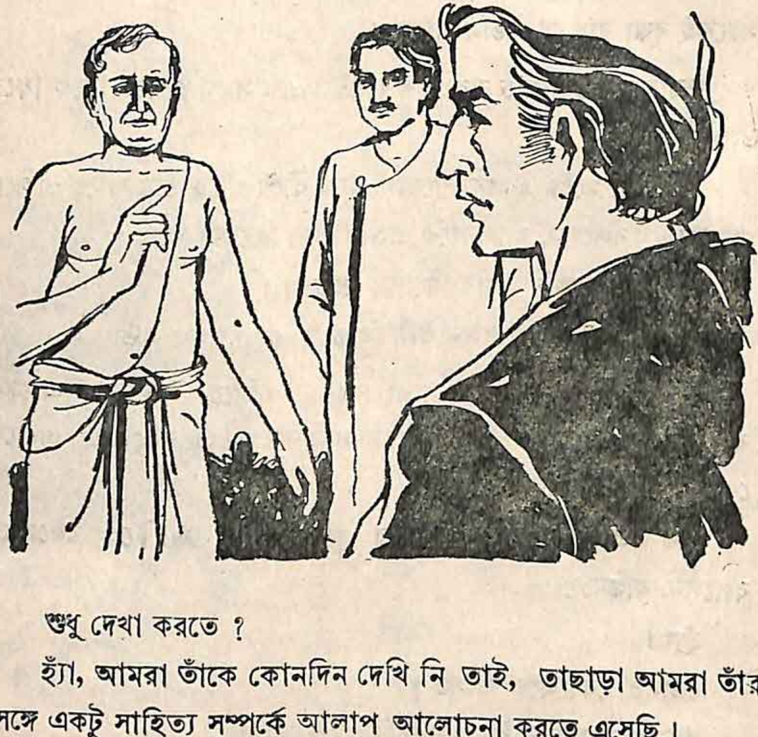
আমরা কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে আসছি।

ভদ্রলোক এবার বললেন, বঙ্কিমচন্দ্র এই বাড়িতেই থাকেন বটে কিন্তু তাঁর সঙ্গে তোমাদের কি কোন দরকার আছে?

হ্যাঁ আমাদের একটু দরকার আছে।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে তোমাদের কী দরকার সেটা যদি বলো……

বৃদ্ধের মুখের কথা শেষ না হতেই তাঁদের একজন বললেন, আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।



শুধু দেখা করতে ?

হ্যাঁ, আমরা তাঁকে কোনদিন দেখি নি তাই, তাছাড়া আমরা তাঁর সঙ্গে একটু সাহিত্য সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করতে এসেছি।

এবারে বৃদ্ধ বললেন, তোমরা ঐ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাও। ঘরে বসো গিয়ে। আমি এক্ষুণি গিয়ে বঙ্কিমবাবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বৃদ্ধের কথামত তাঁরা উপরের ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। নিস্তব্ধ ঘর। শুধু দেওয়াল ঘড়িটার টক্ টক্ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

কিছুক্ষণ পরে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকই একটা জামা গায়ে দিয়ে সেই ঘরে এসে ঢুকলেন।

বৃদ্ধকে আবার ঘরে ঢুকতে দেখে একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, উনি কি এখনই আসছেন ?

উনি মানে ? বঙ্কিমবাবুর কথা জিগ্যেস করছ তো ?

হ্যাঁ।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর কিছু না বলে, তাঁদেরই মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন।

দুই তরুণ একেবারে অবাক। একজন অস্ফুটস্বরে বললেন, আপনিই·········

হ্যাঁ—বৃদ্ধ চেয়ারে বসেই বললেন, এইবার তোমাদের যা বলার বলতে পার, আমিই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ২৪ পরগণার নৈহাটির কাছে কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার হাতে খড়ি হয়। শোনা যায় তিনি একদিনেই বাংলা বর্ণমালা আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর অসাধারণ মেধা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পিতা যাদবচন্দ্রও পুত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে যত্নবান হন। তিনি তখন মেদিনীপুরে চাকরী করতেন। তাই সেখানকার ইংরেজী স্কুলে বঙ্কিমচন্দ্রকে ভর্তি করা হয়। সেখানে ইংরেজ শিক্ষকরাও তাঁর অসাধারণ মেধা শক্তির পরিচয় পান এবং তাঁকে তাঁরা খুবই স্নেহ করতেন।

তারপর শিক্ষা শুরু হল হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে। সেখানেও তিনি

যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। একই সময়ে তিনি সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাছে সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান লাভ করেন। এছাড়া তিনি ফার্সি ভাষাও আয়ত্ত করেন।

হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় গদ্য ও কবিতা রচনা শুরু করেন।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় তিনি বিশেষ কৃতিত্বের জন্যে বৃত্তিলাভ করেন। তারপর আইন পড়ার জন্যে তিনি ভর্তি হলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বি. এ পরীক্ষার প্রবর্তন করে। দশজন ছাত্রের মধ্যে দু'জন ছাত্র এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের একজন। তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট হন।

তিনি ৩৩ বৎসর সরকারী চাকরী করেছিলেন। সাহিত্য জীবন ছিল তাঁর চমকপ্রদ। তাঁর প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তারপর কপালকুণ্ডলা, রাজসিংহ, আনন্দমঠ প্রভৃতি অনেক উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের যুগস্রষ্টা। তাই তিনি সাহিত্য সম্রাট।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রতিভাধর মহামনীষীর লোকান্তর ঘটে।

হে মহাজীবন



আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বাবা ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। একবার একদল ডাকাত ধরা পড়ে এবং তাদের বিচারের জন্যে তাঁর এজলাসে আনা হয়। বিচারে তাদের কিছু-কালের মত জেল হয়। পরে যখন তাদের জেলের মেয়াদ শেষ হয় তখন তারা ছাড়া পায়।

একদিন একটা পনের ষোল বছর বয়সের ছেলে ভগবানবাবুর বাড়িতে এসে হাজির হল। ভগবান-বাবুর পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, হুজুর! আমাকে বাঁচান!

ভগবানবাবু অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? কি হয়েছে তোমার?

ছেলেটা বলল, হুজুর আমি সেই ডাকাত দলে ছিলাম। আপনি আমাকে জেলে পাঠিয়েছিলেন। এখন আমি ছাড়া পেয়েছি। কিন্তু কি করব? এখন তো আমাকে আর কেউ কোন কাজ দেবে না। আবার আমাকে হয়ত ডাকাতদলেই ভিড়তে হবে। আমার আর ডাকাত দলে যেতে ইচ্ছে নেই। আমাকে যদি কোন একটা কাজ দিতে পারেন······

ছেলেটার কথা শেষ না হতেই বালক জগদীশচন্দ্র ভগবানবাবুকে বললেন, বাবা, ও ভাল হতে চায়। ওকে আমাদের বাড়িতেই ভৃত্যের কাজে লাগিয়ে দাও।

ভগবানবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। একবার তিনি জগদীশচন্দ্রের মুখের দিকে আর একবার ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখতে লাগলেন।

একটু পরেই ভগবানবাবু ছেলেটাকে বললেন, তুমি এত অল্প বয়সে ডাকাত দলে গিয়েছিলে কেন?

হুজুর!—ছেলেটা যেন একটু আম্‌তা আম্‌তা করে বলে, সে কথা আর এখন আমায় জিজ্ঞেস করবেন না। তবে আমি নিজের ইচ্ছেয় ওপথে যাই নি হুজুর!

বটে—ভগবানবাবু বললেন, এখন তাহলে সত্যিই তোমার ডাকাত দলে যেতে ইচ্ছা নেই?

না হুজুর।

ঠিক আছে—ভগবানবাবু বলেন, আজ থেকেই তুমি আমার বাড়ির ভৃত্যের কাজ করবে।

ছেলেটাকে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মধ্যে পাঠিয়ে দিলেন তিনি এবং

সেই সঙ্গে জগদীশচন্দ্রকে নির্দেশ দিলেন ছেলেটার গতিবিধির দিকে একটু লক্ষ্য রাখতে।

মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়ির সবাই বুঝতে পারল যে, ছেলেটা সত্যিই খুব ভালো। অসৎ সঙ্গে পড়েই একদিন তাকে ডাকাত দলে ঢুকতে হয়েছিল। তার অমায়িক ব্যবহারে এখন সে বসু বাড়িরই একজন হয়ে গেছে।

বালক জগদীশচন্দ্রকে ছেলেটা রোজ স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসে আবার ছুটির সময় বাড়ি নিয়ে আসে। সে এখন জগদীশচন্দ্রের আবাল্য সঙ্গী। অবসর সময়ে সে জগদীশচন্দ্রের কাছে তার বিগতদিনের ডাকাতির রোমাঞ্চকর কত গল্প বলত। নানারকম বীরত্বব্যঞ্জক গল্প শুনে বালক জগদীশচন্দ্রের মনেও বীরত্ব ও সাহস জেগেছিল। ভৃত্যটি ডাকাতদের নানারকম গোপন কলা কৌশল ও সঙ্কেত ধ্বনির অর্থ তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল এবং তাকে বার বার বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, এই সব সঙ্কেতধ্বনি জানা থাকলে অনেক সময় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

কিছুদিন পরে ডাকাতদের নানারকম সঙ্কেত ধ্বনি শিক্ষা জগদীশচন্দ্রের কাজে লাগল। সত্যিই তিনি সেদিন মহাবিপদ থেকে রক্ষা পেলেন।

সেদিন জগদীশচন্দ্র বাবা মায়ের সঙ্গে পদ্মানদীতে নৌকো করে পৈতৃক গ্রাম রাঢ়ীখালে আসছিলেন। সঙ্গে সেই ভৃত্য ছেলেটিও আছে। রাঢ়ীখালে পৌঁছতে তখনও অনেক দেরী। পদ্মানদীতে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। অন্ধকারের মধ্যেও তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, কয়েকটা নৌকা সারিবদ্ধ ভাবে তাঁদের নৌকার পিছনে ছুটে আসছে। নৌকাগুলো যে জলদস্যুদের নৌকা সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না। ভগবানবাবুও চিন্তায় পড়লেন। কী হবে এখন?

ভৃত্য ছেলেটার পরামর্শ মত কিশোর জগদীশচন্দ্র তখন নৌকোর পাটাতনের উপর এসে দাঁড়ালেন। সেই গোপন সঙ্কেত ধ্বনিতে চিৎকার করলেন কয়েকবার।



আশ্চর্য! খানিকক্ষণ পরেই দেখা গেল সেই সারিবদ্ধ নৌকাগুলো আর পিছনে ছুটে আসছে না। তারা সবাই দূরে চলে গেছে। নৌকার মধ্যে এবার সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের নৌকা রাঢ়ীখাল গ্রামের ঘাটে এসে ভিড়ল। রাত তখন অনেক।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের ঢাকা জেলার রাঢ়ীখাল গ্রামে জগদীশচন্দ্রের জন্ম হয়। গ্রাম্য পাঠশালাতেই তাঁর পড়াশুনো আরম্ভ হয়। উদ্ভিদের প্রতি তাঁর ছিল আবাল্য আকর্ষণ।

ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে জগদীশচন্দ্র প্রথমে হেয়ার স্কুল ও পরে সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ বিভাগ থেকে বি. এ উপাধি পাবার পর তিনি লণ্ডন যাত্রা করেন।

লণ্ডনে শিক্ষা প্রাপ্তির পর জগদীশচন্দ্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ট্রাইপোজ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন।

পরে দেশে ফিরে অধ্যাপনার কাজকেই তিনি তাঁর জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে এই তরুণ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র অক্লান্ত ও অদম্য উৎসাহে বীক্ষণাগারের নব নব আবিষ্কারে মেতে উঠলেন।

বিদ্যুৎ তরঙ্গ সম্পর্কিত তাঁর আবিষ্কার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের প্রশংসা অর্জন করে এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি. এস-সি উপাধি প্রদান করেন। বেতার সম্পর্কিত তাঁর মূল্যবান গবেষণা স্বীকৃতি লাভ করার আগেই মার্কনী নামে এক সহযোগী বিজ্ঞানী সেই গবেষণার কাগজপত্র আত্মসাৎ করে নেন।

এরপর ক্ষুণ্ণ মনে তিনি পদার্থবিদ্যা ছেড়ে উদ্ভিদবিদ্যায় মনোনিবেশ করেন। উদ্ভিদের প্রাণ চেতনার কথা তিনি প্রমাণিত করলেন এবং বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে তা স্বীকৃতি লাভ করল।

কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দির তাঁরই প্রতিষ্ঠিত।

জগদীশচন্দ্র বসু শুধুমাত্র বিজ্ঞানাচার্যই ছিলেন না, সাহিত্য ভারতীরও তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সেবক।

বিশ্ববন্দিত এই বৈজ্ঞানিক ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

হে মহাজীবন



একদিন সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের আশ্রমে শিশু বিভাগের হোস্টেলে এক নতুন মাস্টার মশাই এসেছেন।

হোস্টেলের সব ছাত্ররাই উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে তাঁকে নমস্কার করল। শুধু একটি ছেলে হাতজোড় করে নমস্কার করা তো দূরের কথা—উঠেও দাঁড়াল না।

একটু পরেই মাস্টারমশাই চলে গেলেন।

হোস্টেলের ছাত্ররা সবাই ছেলেটিকে ঘিরে ধরল। তাদের মধ্যে একজন তাকে বলল, তুমি ভাই আজ বড্ড অন্যায় কাজ করলে।

অন্যায় করেছি ?—ছেলেটা যেন অবাক হয়ে বলে,

কী অন্যায় আবার করলাম ?

মাস্টারমশাই এলে আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম, তাঁকে নমস্কার করলাম। কিন্তু তুমি উঠেও দাঁড়ালে না আর নমস্কারও করলে না। এইটাই তুমি অন্যায় করেছ।

আর একজন ছাত্র বলল, এর জন্যে কাল তোমাকে ঐ মাস্টার মশায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

কক্ষণো না—ছেলেটা দৃঢ় কণ্ঠে বলে, আমি কোন অন্যায় করি নি।

অন্যায় করো নি ?

না।

তুমি মাস্টারমশায়ের কাছে ক্ষমা চাইবে না ?

না।

অন্য একজন ছাত্র বলল, বেশ তবে গুরুদেবের কাছে চলো।

বেশ, তাই চলো।

সবাই ছেলেটাকে নিয়ে চলল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতন উত্তরায়ণের একটি ঘরে বসে লিখছিলেন।

ছেলেরা সবাই সেই ছেলেটাকে নিয়ে সেখানে এসে হাজির হল।

তারা সব ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে বলল। সেই সঙ্গে তারা তাঁকে এটাও জানাল যে, যদি ছেলেটি মাস্টারমশায়ের কাছে ক্ষমা না চায় তাহলে ছেলেরাই এর জন্যে বিচার সভা বসাবে।

রবীন্দ্রনাথ এবার সবাইকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বললেন। সবাই চলে গেল। কেবল সেই ছেলেটিকে তিনি আরো কাছে ডাকলেন।

সস্নেহে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, তুমি নতুন মাস্টারমশাইকে নমস্কার না করে ভারী অন্যায় করেছ।



না গুরুদেব—ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, নমস্কার না করে আমি কিছু অন্যায় করি নি। আমি তো মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধা করি। নমস্কার নাই বা করলাম।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, তবুও নমস্কার করতে হয়। তুমি আজই তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিও।

না গুরুদেব—সে বলে, আমি ক্ষমা চাইতে পারব না।

আরো কতক্ষণ রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নানাভাবে বোঝাতে লাগলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু না। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ছেলেটা বড় একগুঁয়ে। কিছুতেই সে ক্ষমা চাইবে না। ছেলেরাই বিচার সভা

বসাবে। তারপর? হয়ত তাকে এই আশ্রমই ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু ছেলেটার বাবা মা তো অনেক আশা করে এখানে পাঠিয়েছেন। সে যদি আশ্রম থেকে বিতাড়িত হয়ে বাড়ি ফিরে যায় তখন তাঁরাও তো মনক্ষুণ্ণ হবেন।

এই সব কত কথাই ভাবতে লাগলেন রবীন্দ্রনাথ।

পরদিনই বিচার সভা বসল। আম্রকুঞ্জে ছেলেরাই সেই বিচার সভার আয়োজন করেছে। সভার বিচারকের আসনে বসেছে শিশু বিভাগেরই একটি ছেলে। তার পাশেই বসে আছেন সেই নতুন মাস্টারমশাই।

ক্ষুদে সভাপতি ঘোষণা করলেন, এখনই আমাদের সেই সহপাঠীকে, যে নিজের অন্যায় স্বীকার করে নি নিয়ে আসা হোক।

কিন্তু একি! সেই ছেলেটিই হঠাৎ গুরুদেবের সঙ্গে সভার মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

গুরুদেবকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়ালেন সেই নতুন মাস্টারমশাইও।

রবীন্দ্রনাথ এবার নিজেই হাত জোড় করে মাস্টারমশায়ের দিকে ফিরে বললেন, মাস্টারমশাই! এই ছেলেটি বড়ই অবুঝ। অন্যায় করেও ও নিজে কিছুতেই ক্ষমা চাইবে না। তাই আমি এসেছি ওর হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে। আপনি আমার ক্ষমা……

গুরুদেবের মুখের কথা শেষ না হতেই সেই একগুঁয়ে ছেলেটা হঠাৎ ছুটে গেল নতুন মাস্টারমশায়ের কাছে। তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, মাস্টারমশাই। কাল আমি বড় অন্যায় করেছি। আমায় আপনি ক্ষমা করুন।

নতুন মাস্টারমশাই তাড়াতাড়ি পায়ের কাছ থেকে তাকে টেনে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

আর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলেন। সে হাসির কোন তুলনা হয় না।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ছিলেন পাণ্ডিত্যে ও ধর্মপ্রাণতায় একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী। মাতা সারদাময়ীও ছিলেন এক ধর্মপ্রাণা মহীয়সী নারী।

রবীন্দ্রনাথ ধনীর সন্তান হলেও বাল্য কালে তাঁকে খুবই সাদাসিধে ভাবে থাকতে হত। বাড়ির ভৃত্যদের কড়া শাসনের মধ্যে তাঁকে দিন কাটাতে হত। বাইরে যাবার কোন উপায় ছিল না। যথাসময়ে তাঁকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা বিধি নিষেধ তাঁর ভালো লাগল না। শেষ পর্যন্ত তিনি বিদ্যালয়ে যাওয়াই বন্ধ করে দিলেন।

বিদ্যালয় ত্যাগ করলেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পড়াশুনো বন্ধ করে দেন নি। বাড়িতে তিনি গৃহশিক্ষকের কাছে, বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি ব্যাকরণ, জ্যোতিষ এবং বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। তিনি তাঁর মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে যান এবং সেখানে ব্রাইটনের এক স্কুলে ও পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছু দিন অধ্যয়ন করেন।

রবীন্দ্রনাথ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি কেবল কবি ছিলেন না—তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, গল্প লেখক, নাট্যকার, প্রবন্ধ লেখক, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, সমাজ সংস্কারক এবং দেশপ্রেমিক।

এছাড়া সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী আর চিত্রকলাতেও অসামান্য ; কুশলী অভিনেতা হিসাবেও তাঁর পরিচয় আছে।

নিতান্ত বালক বয়সেই তাঁর কবিতা লেখায় হাতেখড়ি। এই কবিতাই তাঁকে বিশ্বকবির মর্যাদা দিয়েছে। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'—এই দুটি বাক্যর মধ্যেই তিনি খুঁজে পেলেন বাংলা ছন্দকে। হয়ত তাই তিনি পেয়েছিলেন ছন্দ লেখার প্রেরণা।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা 'অভিলাষ' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি ভানুসিংহের পদাবলী ও বাল্মীকি প্রতিভা কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে মানসী, বলাকা, মহুয়া, খেয়া, নৈবেদ্য, কথা ও কাহিনী প্রভৃতি বিখ্যাত। উপন্যাসের মধ্যে বিখ্যাত গোরা, চোখের বালি, মালঞ্চ, ঘরে বাইরে, রাজর্ষি, নৌকাডুবি, যোগাযোগ ইত্যাদি। আর নাটকের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে আছে ডাকঘর, বিসর্জন, মুকুট, চণ্ডালিকা, অচলায়তন, চিরকুমার সভা প্রভৃতি।

তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হবার পর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রীতির তুলনা বিরল। দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করার জন্যে তিনি দেশবাসীর মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজ দ্বারা নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ স্বরূপ ইংরেজ সরকারের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন মহান শিক্ষাব্রতী। বোলপুরে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা তাঁর এক স্মরণীয় কীর্তি। এই শান্তিনিকেতনে তিনি প্রাচীন গুরু গৃহের আদর্শে মুক্তাঞ্চলে শিক্ষাধারা প্রবর্তন করেন। বর্তমানে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতী নামে বিখ্যাত।

শান্তিনিকেতনের কাছেই শ্রীনিকেতনে আদর্শ কৃষিকার্য ও কুটির শিল্পের ব্যবস্থা তাঁর বহুমুখী প্রতিভার আর এক নিদর্শন।

সবচেয়ে গর্বের কথা তাঁর লেখা গানই ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ মর্ত্যলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন।

হে মহাজীবন



কলকাতার একজন নামকরা এটর্নি—নাম বিশ্বনাথ দত্ত। তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তির কথা সবাই জানে। তাই তাঁর কাছে বহু মক্কেলের আসা যাওয়া। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান নানা জাতির মক্কেল আসে তাঁর কাছে।

বিশ্বনাথবাবুর বৈঠকখানা ঘরে মক্কেলদের জন্যে অনেকগুলো হুঁকো সাজানো থাকত। তারা হুঁকোয় তামাক খেত।

বিশ্বনাথবাবুর ছেলেদের মধ্যে নরেন যেন একটু বেশী ডানপিটে। সব ব্যাপারেই তার যেন একটু কৌতূহলও বেশী। সে শুনেছে যে, অন্য জাতের এঁটো খেলে

নাকি জাত যায়। তখন তার কত আর বয়স হবে? দশ এগারো বছর। এঁটো খেলে জাত যাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। সে ভাবে এসব মিথ্যে কথা। কারো ছোঁয়া বা এঁটো খেলে মানুষের জাত যাবে কেন?

একদিন দুপুরের কিছুক্ষণ আগে যখন বাবার মক্কেলরা সব ঘর থেকে চলে গেছে ঠিক তখনই নরেন চুপি চুপি বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে ঢোকে। বিভিন্ন জাতির জন্যে সাজানো হুঁকোগুলো একে একে হাতে তুলে নেয়।

খুব ভাল করে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে কেউ আসছে কিনা। না। কাছে পিঠে কেউ নেই। বাবাও হয়ত এতক্ষণে কোর্টে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন। এখনই ঠিক সময়।

নরেন মনের আনন্দে সব হুঁকোগুলো থেকে একে একে তামাক খেতে শুরু করে দিল। মক্কেলদের গল্প গুজব আর নানা রকম আলোচনায় যে বৈঠকখানা ঘর এতক্ষণ জম জমাট ছিল সেই ঘর এখন নিস্তব্ধ। শুধু ফুরুৎ ফুরুৎ তামাক খাওয়ার শব্দ।

ঠিক তখনই কোর্টে যাবার আগে বিশ্বনাথবাবু হঠাৎ কী যেন একটা দরকারে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকলেন।

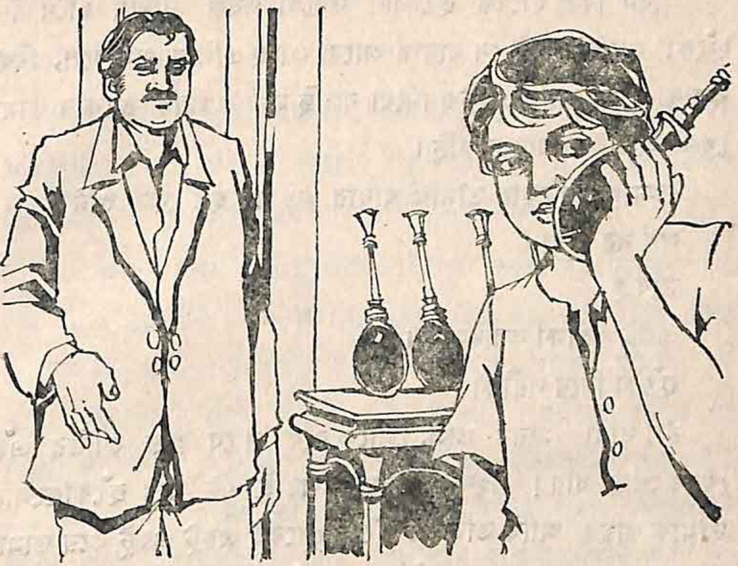
নরেন তখন একমনে ফুরুৎ ফুরুৎ করে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে।

বিশ্বনাথ বাবু ঘরে ঢুকেই অবাক। কিছুক্ষণ তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বাবার আগমন নরেন জানতেই পারে নি। সে তখন যেন পরম তৃপ্তিতে অর্ধনিমিলিত চক্ষে হুঁকো টেনেই চলেছে।

নরেন!—গম্ভীরভাবে বিশ্বনাথ বাবু বললেন, এটা কী হচ্ছে?

কি বাবা ?



বিশ্বনাথ বাবুর কণ্ঠস্বর এবার একটু চড়া হয়ে ওঠে। বলেন, এখনো কিছু বুঝতে পারছ না ?

নরেন কোন জবাব দেয় না। হুঁকোটা হাতে করেই সে মাথা নীচু করে বসে থাকে।

এরকম কতদিন চলছে ? —বিশ্বনাথ বাবু বললেন, মক্কেলরা চলে যাবার পর রোজই বুঝি এই ভাবে হুঁকোয় তামাক খাওয়া হয় ? অভ্যেসটা তাহলে বেশ ভালই হয়েছে ?

না বাবা —নরেন বলে ওঠে, আমি কোনদিনই তামাক খাই নে বাবা।

চুপ! মিথ্যে বলবে না।

নরেন কিন্তু হাতের হুঁকোটা তখনো পর্যন্ত নামিয়ে রাখে নি। হুঁকো হাতে করেই সে বাবার আরো কাছে এগিয়ে এসে বলে, বিশ্বাস কর বাবা! আমি একটুও মিথ্যে বলছি না। আমি হুঁকোর তামাক খেতে আজই এ ঘরে ঢুকেছি।

কেন? হুঁকোয় তামাক খাবার এত শখ হল কেন শুনি?

শখ নয় বাবা।

তবে?

একটু পরীক্ষা করছিলাম।

হুঁকো নিয়ে পরীক্ষা?

হ্যাঁ বাবা—নরেন বলল, লোকে বলে না যে অন্য জাতির এঁটো খেলে জাত যায়! হিন্দু মুসলমান সবাই এই ঘরে হুঁকোগুলোতে তামাক খায়। আমি তাই সব হুঁকো থেকেই একটু একটু করে তামাক খেয়ে শুধু দেখছিলাম ওদের এঁটো করা হুঁকোয় আমার জাত যায় কিনা।

বিশ্বনাথ বাবু সকৌতুক নয়নে তাকালেন ছেলের মুখের দিকে। বললেন, তাই নাকি। এই জন্যে তোমার তামাক খাওয়া?

হ্যাঁ বাবা।

কিন্তু কী বুঝলে?

নরেন জবাব দিল, বাবা আমার তো মনে হচ্ছে এতগুলো হুঁকোয় তামাক খেয়েও আমার জাত যায় নি। তুমিই বলো না বাবা তোমার কি মনে হচ্ছে আমার জাত গিয়েছে?

না নরেন, তোমার জাত যায় নি—বলেই সস্নেহে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

নরেন নামে এই ছেলেটির পুরো নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। আরো পরে তিনি হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

কলকাতার সিমলা অঞ্চলে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত দত্ত পরিবারে নরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ছোটবেলায় তাঁর ডাক নাম ছিল বিলে। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত এবং মাতার নাম ভুবনেশ্বরী দেবী।

ছেলেবেলা থেকেই নরেন্দ্রনাথ ছিলেন স্পষ্টবাদী নির্ভীক এবং কিছুটা দুরন্তও বটে। ধ্যান ধ্যান খেলা ছিল তাঁর অতি প্রিয় খেলা। এ খেলায় কোন সঙ্গী সাথীর দরকার হত না। বাড়ির মধ্যেই কোন এক নির্জন স্থানে একা ধ্যানে বসে যেতেন। বাড়ির লোকে হয়ত তখন তাঁকে খুঁজে পেত না। চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠত। তিনি মেট্রোপলিটন স্কুল থেকে প্রবেশিকায় উত্তীর্ন হন। ছাত্রজীবনে নানা রকম খেলাধুলা, ব্যায়াম এবং গান বাজনার দিকে তাঁর খুবই ঝোঁক ছিল। স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি এ পরীক্ষায় পাশ করার পর তিনি আইন পড়তে থাকেন। কিন্তু তখনই তাঁর পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁকে সংসারের ভার নিতে হয়।

এরপর তিনি একদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর তিনি সন্ন্যাস জীবন যাপন করতে আরম্ভ করেন। তখন থেকেই তাঁর নাম হল স্বামী বিবেকানন্দ। তারপর শিবজ্ঞানে জীব সেবার মন্ত্র প্রচার করতে তিনি সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন। তখনই শোনা যায় এই পরিব্রাজক বীর সন্ন্যাসীর উদাত্ত ঘোষণা 'হে

ভারত ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।'

তারপর তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে আরো শোনা গেল—'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে যোগ দিলেন। সেখানেও তিনি উদাত্ত কণ্ঠে হিন্দুধর্মের মহিমা প্রচার করলেন। তাঁর যুক্তিযুক্ত বাণী শুনে সেই ধর্ম মহাসভা যেন একেবারে বিমুগ্ধ হয়ে গেল। সেখানে অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁর অগণিত বিদেশী শিষ্যদের মধ্যে মার্গারেট নোবেল্ বিখ্যাত। ইনিই পরে ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিতা হন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন।

হে মহাজীবন



রেড রোড।

কলকাতার একটা রাজপথের নাম। ইংরেজ রাজত্ব কালে এই রাস্তাটা ছিল ইংরেজ অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গদের জন্যে সংরক্ষিত। এই পথে হয়ত সত্যিই নিষেধের রাঙা আলো জ্বলতো না কিন্তু এই রেড রোড দিয়ে কেউ যেতে পারত না।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি।

একদিন তিনি মোটরে করে রেড রোডের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কিছুদূর যেতেই একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ হাত উঁচু করে দাঁড়াবার নির্দেশ দিল।

স্যার আশুতোষের গাড়ির ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি থামিয়ে দিল।

শ্বেতাঙ্গ পুলিশ এল গাড়ির কাছে। বলল, ফিরে যেতে হবে।

ফিরে যেতে হবে? —ড্রাইভার বলল, কেন? রাস্তা কি আজ বন্ধ আছে?

না।

তবে?

এবারে শ্বেতাঙ্গ পুলিশটি বলল, এ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন কেন?

গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে এবার আশুতোষ নিজেই বললেন, কেন? এ রাস্তায় কী আছে?

কী আছে জানেন না?

না।

তখন পুলিশটি কোন জবাব না দিয়েই কিছুক্ষণ চুপ করে হাতের রুমালখানা নাড়াতে লাগল।

গাড়ির ড্রাইভার আবার প্রশ্ন করল, এ রাস্তায় কি কোন বিপদ আছে?

না, বিপদের কিছু না—পুলিশ জবাব দেয়, তবে এই রেড রোড কেবল ইউরোপীয়ানদের জন্যে। কোন ভারতবাসীর এ পথ দিয়ে যাবার অধিকার নেই।

তাই নাকি?— আশুতোষ একটু ব্যঙ্গ করে বললেন, কিন্তু এখন কী করতে হবে?

পুলিশও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, এখন ফিরে যেতে হবে। এ পথে আপনাকে যাবার অনুমতি কে দিয়েছে?

আশুতোষ ভ্রূ কুঁচকে বললেন, আমার দেশের রাস্তা দিয়ে আমাকে যেতে হবে তোমাদের অনুমতি নিয়ে ?

নিশ্চয়ই।



আশুতোষ তখন মনে মনে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। সেই শ্বেতাঙ্গ পুলিশকে বললেন, তুমি জানো আমি কে ? মাঝ পথে আমার গাড়ি অবরোধ করার অধিকারই বা তোমাকে কে দিয়েছে ?

শ্বেতাঙ্গ পুলিশটি এতক্ষণে সম্ভবতঃ তাঁকে চিনতে পারে। তাই আর কালবিলম্ব না করে তক্ষুনি সে রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

স্যার আশুতোষের গাড়িও সশব্দে রেড রোড অতিক্রম করে চলে গেল।

বাড়িতে ফিরে আশুতোষ মনে মনে ভাবতে লাগলেন, যেমন করেই

হোক এর একটা বিহিত করতেই হবে। তিনি না হয় হাইকোর্টের জজ। তাই পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দিল। কিন্তু যারা সাধারণ মানুষ তারা তো কোনদিনই এই রেড রোড অতিক্রম করতে পারবে না। তাই একটা অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলেন না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি কিছুক্ষণ নিজের ঘরেই পায়চারি করতে লাগলেন।

তারপর এক সময় তিনি টেলিফোনের রিসিভারটা হাতে তুলে নিলেন।

তখন বাংলার গভর্নর ছিলেন কারমাইকেল।

তিনি কারমাইকেলকেই টেলিফোনে ডাকতে লাগলেন, হ্যালো! ওধার থেকে কারমাইকেল সাড়া দিলেন, হ্যালো! আপনি কে কথা বলছেন?

আমি আশুতোষ মুখার্জি কথা বলছি।

বলুন।

আশুতোষ বললেন, আচ্ছা, রেড রেড দিয়ে নাকি কোন ভারতবাসী যেতে পারবে না— এটা কেমন কথা?

ওধার থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কারমাইকেল বোধ হয় ব্যাপারটা যে কী হয়েছে তা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছেন। সেই জন্যেই তিনি হয়ত চুপ করে ছিলেন কিছুক্ষণ।

আশুতোষ কিছুক্ষণ কোন সাড়া না পেয়ে আবার ডাকলেন, হ্যালো! হ্যালো!!

ওধার থেকে এবার কারমাইকেলের কণ্ঠ ভেসে এল, ইউ মে গো।

আশুতোষ বললেন, আর একটু পরিষ্কার করে বলুন।

মানে ?

মানে ইংরাজিতে 'ইউ' শব্দের অর্থ 'তুমি'ও হয় আবার 'তোমরা' ও হয়। রেড রোড দিয়ে যাবার প্রসঙ্গে এইমাত্র যে আপনি বললেন, 'ইউ মে গো'—এতে আমি কী বুঝব ? রেড রোড দিয়ে কি শুধু আমিই যেতে পারব ? না সব ভারতীয়ই এই পথে যাতায়াত করতে পারবে ?

কারমাইকেল স্যার আশুতোষের তেজস্বিতা ও স্বদেশপ্রীতির কথা খুব ভাল করেই জানতেন। তিনি আরো জানতেন যে, এই পথ চলার অধিকার নিয়ে আশুতোষকে অসন্তুষ্ট করার ফল ইংরেজদের পক্ষে মোটেই ভালো হবে না।

তাই তিনি রেড রোড দিয়ে যাতায়াতের জন্যে সকলেরই সমান অধিকারের কথা সেইদিনই ঘোষণা করলেন।

তেজস্বিতার জন্যে আশুতোষ 'বাংলার বাঘ' নামে বিখ্যাত ছিলেন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মাতা জগত্তারিণী দেবী।

পড়াশুনায় আশুতোষ ছিলেন মেধাবী। তের বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় হন। তারপর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৮৮৫ সালে এম, এ পরীক্ষাতেও প্রথম হন। পরে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ছাত্র জীবন ছিল তাঁর অত্যন্ত গৌরবময়। আইন পরীক্ষাতেও সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি

বিচারপতির পদ লাভ করেন এবং পরে কিছুদিনের জন্য তিনি প্রধান বিচারপতির পদও অলঙ্কৃত করেন।

তিনি চারবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মনোনীত হন। নানাভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন করাই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনও ছিল তাঁর লক্ষ্য। আশুতোষ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হয় তাঁরই প্রেরণায়।

পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করেও স্যার আশুতোষ ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী। যিনি বাংলার বাঘ নামে বিখ্যাত সেই একান্ত কঠোর এবং নির্ভীক পুরুষটির হৃদয়টা ছিল কিন্তু ফুলের মতই কোমল। তিনি ছিলেন ছাত্র সমাজের প্রকৃত দরদী বন্ধু। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সমূহের প্রশ্নপত্র আগেই তিনি ভালভাবে দেখে নিতেন। তাঁর কাছে যদি খুব কঠিন মনে হত তবে সেই সব প্রশ্নপত্র তিনি অনুমোদন করতেন না।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বিহার রাজ্যে এক মামলার ওকালতি করতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

হে মহাজীবন



জন্মাষ্টমীর মাঝ রাত।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে ভূমিষ্ঠ হল একটি শিশু। সবাই ভাবল এ নিশ্চয়ই দেবশিশু। এমনই এক রাতে কংসের কারগারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সময়টাও ছিল মাঝরাত। সেই পুণ্য তিথিতে যে শিশুর জন্ম হল তাকে নিয়ে সবার অনেক আশা। এ ছেলে একদিন নিশ্চয়ই যশস্বী হবে।

নবজাতকের নাম রাখা হল অবন।

ছোট্ট অবন কিন্তু মোটেই দুষ্টু-দুরন্ত ছিল না। বেশ শান্তশিষ্ট ছেলে। বাড়ির পদ্মমাসির উপর তার পড়াশুনোর

ভার পড়ল।

পদ্মমাসি তাকে খাওয়ায়, স্নান করায়, ঘুম পাড়ায়। তাকে গল্প বলে। নানা রকমের গল্প। রূপকথা, রাক্ষস খোক্কসের গল্প আরো কত কি। যখন ছোট্ট অবনের চোখে কিছুতেই ঘুম আসছে না তখন পদ্মমাসি তাকে গল্প বলে ঘুম পাড়ায়। তেপান্তরের মাঠের ধারে সেই ভয়ঙ্কর দৈত্যদের আস্তানায় এক অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যা বন্দী হয়ে আছে। দৈত্যদের মায়াজালে সে অনেকদিনের মত ঘুমিয়ে আছে। কিছুতেই ঘুম তার ভাঙ্গছে না। ভাঙ্গবেও না। যতক্ষণ না কোন রাজপুত্তুর সোনার কাঠি তার মাথায় না ছোঁয়াবে ততক্ষণ সে ঘুমিয়েই রইবে। তারপর সেই কথা শুনে এক দেশের এক রাজপুত্তুরের মনে খুব দুঃখ হল। এক পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে সোনার কাঠি হাতে নিয়ে সেই রাজপুত্তুর ছুটল তেপান্তরের মাঠে সেই দৈত্যদের আস্তানার দিকে। টগ্‌বগ্‌ টগ্‌বগ্‌ করে ছুটছে রাজপুত্তুরের ঘোড়া।

রাজপুত্তুর কিন্তু তখনো তেপান্তরের মাঠে পৌঁছতে পারে নি। পদ্মমাসি দেখে অবন এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। কাজেই রাজপুত্তুরকে আর তেপান্তরের মাঠে যাবার দরকার নেই। এখন আর তাকে সেই বন্দী রাজকন্যার মাথায় সোনার কাঠি ছোঁয়াতে হবে না। দরকার নেই তার ঘুম ভাঙ্গাবার। গল্প এইখানেই অসমাপ্ত হয়ে রইল। পদ্মমাসিও এবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

এইভাবেই ছোট্ট অবন ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল।

তারপর অবনের বয়স হল চার বছর। পদ্মমাসির তদারকিও শেষ। এখন থেকে অবনকে দেখাশুনোর ভার পড়ল বাড়ির্‌ ভৃত্য রামলালের উপর।

রামলালও তাকে গল্প শোনায়। দেশ বিদেশের সব অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অবনের বড় বেশী ভাব। রবিকাকাকে না হলে তার চলেই না। কাগজের উপর আঁকি বুকি কাটায় কিংবা মাটি নিয়ে পুতুল গড়ায় ছিলেন রবিকাকাই তাঁর সঙ্গী ও উৎসাহদাতা।

অবনের মাও অবনকে অনেক গল্প শোনাতেন। তার বেশীর ভাগ গল্প ছিল রামায়ণ আর মহাভারতের গল্প। রামায়ণ মহাভারতের বীরদের উপাখ্যান শুনতে শুনতে ছোট্ট অবনের মনেও রোমাঞ্চ জাগত।

অবনকে ভর্তি করা হল নর্মাল স্কুলে। সেখানে ইংরাজীর মাষ্টার মশাই ছিলেন লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত।

একদিন ইংরাজীর ক্লাস চলছে।

মাষ্টারমশাই সবাইকে লক্ষ্য করে নানা রকম ইংরাজী শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। যে পারছে জবাব দিচ্ছে। কখনো কখনো আবার ইংরাজী বানান বলছেন আর জানতে চাইছেন তার সঠিক উচ্চারণটুকু।

একবার মাষ্টার মশাই প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা এবার আমি তোমাদের কয়েকটা ইংরেজী অক্ষর বলব ঃ তোমরা তার উচ্চারণটা শুধু বলবে।

অনেকেই উচ্চস্বরে বলে ওঠে, বলুন স্যার।

মাষ্টারমশায় বলতে লাগলেন, পি, ইউ, ডি, ডি, আই এন, জি, াক হবে ?

সকলেই এবার চুপ করে রইল।

একটু সময় দিলেন মাষ্টার মশাই। ভাবতে লাগল সবাই। কিন্তু কারো মুখে কোন জবাব নেই।

কি হল ?—মাষ্টার বললেন, কেউ বলতে পারলে না ?

সকলেই নীরব।

মাষ্টার মশাই এবার নিজেই বললেন, তোমরা সবাই এবার জেনে নাও, এর উচ্চারণ হবে:পাডিং।

অবন এবারে উঠে দাঁড়াল। বলল, স্যার এর উচ্চারণটা তো পাডিং হবে না।

পাডিং হবে না ?

না।

তবে কি ?

অবন জবাব দেয়, এর উচ্চারণ হবে পুডিং।

মাষ্টার মশাই ধমকে উঠে বললেন, না, এটা পাডিং।

না স্যার—অবন আবার বলে, এটা হবে পুডিং, আমি তো রোজই এ জিনিসটা বাড়িতে খাই।

না না—প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন মাষ্টার মশাই, বলো পাডিং।

অবন কিন্তু অটল। বলল, ওটা পাডিং কিছুতেই হতে পারে না স্যার। ওটা পুডিংই হবে।

তুমি পাডিং বলবে না ?

না।

অবনের সাহস দেখে সবাই তো একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। ছেলেটা করে কি! কী শাস্তি যে আজ ওকে ভোগ করতে হবে কে জানে!

ইংরাজীর ক্লাশটাই ছিল সেদিনের শেষ পিরিয়ড। তাই একটু পরেই ছুটির ঘণ্টা পড়ে গেল। কিন্তু লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত ক্লাস ছেড়ে

গেলেন না। আর ছেলেরাও কেউ তাই বাইরে যেতে পারছে না।
সবাই কেমন যেন উস্‌খুস্‌ করছে।

একটু পরেই মাষ্টার মশাই বললেন, অবন বাদে তোমরা সবাই বাড়ি চলে যাও। বেয়াদপ্‌ ছেলেটার আজ এক ঘন্টা কন্‌ফাইন।

মাষ্টার মশাই যেন রাগে ফুসতে লাগলেন। কটাক্ষে তিনি অবনের দিকে তাকাতে লাগলেন। ঘন ঘন তাঁর চোখের পাতা পড়তে লাগল।



সহপাঠিরা সবাই বাড়ি চলে গেল। কেবল অবন রইল একা।

ভৃত্য রামলাল রোজ অবনকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসত। আবার ছুটির সময় তাকে বাড়ি নিয়ে আসত। সেদিনও রামলাল অবনকে

আনতে গিয়ে দেখে স্কুলের কোন ক্লাসেই কেউ নেই। অবন কেবল একা চুপ করে বসে আছে।

অগত্যা রামলালকেও বারান্দায় বসে অপেক্ষা করতে হল।

বাড়ি ফেরার পর পিসিমাই আগে জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে ? আজ এত দেরী হল কেন ?

অবন কোন কথা বলল না। মুখখানা তার যেন কাঁদো কাঁদো।

রামলালই জবাব দিলে, মাষ্টার মশাই ওকে এক ঘণ্টা আটকে রেখেছিল পিসিমা।

কেন ?—পিসিমা ভ্রূ ছুটো কুঁচকে বললেন, তুই কি করেছিলি রে অবন ?

অবন এবার সব কথা খুলে বলল তার পিসিমাকে।

সব শুনে পিসিমা কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন।

সেইদিন থেকেই অবনের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হল। বাড়িতেই পড়াশুনোর ব্যবস্থা করা হল।

সেদিনের সেই ছোট্ট অবনই হলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে অবনীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁর পিতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ভাল ছবি আঁকতে পারতেন। পিতার প্রভাবে পুত্রও তাই ছোট্টবেলা থেকে ছবি আঁকায় মনোনিবেশ করেন।

নর্মাল স্কুল পরিত্যাগ করার পর তিনি কিছুদিন সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনো করেন। পরে গিলহাডি ও পামার নামে ছ'জন বিখ্যাত

বিদেশী চিত্রশিল্পীর কাছে শিক্ষালাভ করে ছবি আঁকায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথমে তিনি এই কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ এবং পরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

চিত্রশিল্পী হিসাবে তিনি হলেন পৃথিবী বিখ্যাত। তুলির সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিন্তু ছোটদের জন্যে কলমও ধরেছেন। আর সেই কলম থেকে বেরিয়েছে রাজকাহিনী, ক্ষীরের পুতুল, নালক প্রভৃতি। চারু-শিল্পের জন্যে তাঁর বিখ্যাত বইটির নাম ভারত শিল্প।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন।

হে মহাজীবন



পাড়াগাঁয়ের ছেলে। সারাটা দিন টো টো করে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। শখ নানা রকম পশু পাখি পোষা। এমন কি কীট পতঙ্গ পুষতেও পিছপা নয় সে। তার ছিল একটা ছোট্ট কাঠের বাক্স। তার ভিতরে সে নানা রকমের ফড়িং ধরে রাখত। জল-ফড়িং, গঙ্গাফড়িং আরো কত কি! মাঝে মাঝে সেই ফড়িংদের মধ্যে কৌশলে লড়াই বাঁধিয়ে দিত। তারপর আপন মনে নিজেই সে হাততালি দিত। খুব মজা হত।

কাঠের বাক্সের মধ্যে পোষা ফড়িংগুলোর খাওয়ার দিকেও তার কড়া নজর থাকত। ছোট্ট ছোট্ট বাটি

করে তাদের উপযোগী নানা রকম খাবার দিত সেই বাক্সটার মধ্যে।

একদিন সকালে ছেলেটা বেড়াতে বেড়াতে সরস্বতী নদীর ধারে এসে পৌঁছল। নদীর ধারে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা ফড়িং দেখতে পেল সে। সুন্দর ফড়িংটার রং। একটা নলখাগড়ার লিক্‌লিকে সরু ডালে ফড়িংটা বসে আছে। এর আগে ছেলেটা তাদের বাড়ির আশে পাশে কিংবা মাঠের ধারে কত ফড়িং ধরেছে। কিন্তু নদীর ধারের এই ফড়িংটা যেন তাদের সবার থেকে আলাদা। মনে হল, এত সুন্দর রং বেরঙের ফড়িং সে এর আগে কখনো দেখে নি।

কিছুক্ষণ সে একদৃষ্টে ফড়িংটা দেখতে লাগল।

তারপর সে ফড়িংটাকে ধরবার জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে খুব আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে লাগল। এক পা দু'পা এগিয়ে যেতেই ফড়িংটা উড়ে গেল। আর একটা নলখাগড়ার ডালে গিয়ে বসল।

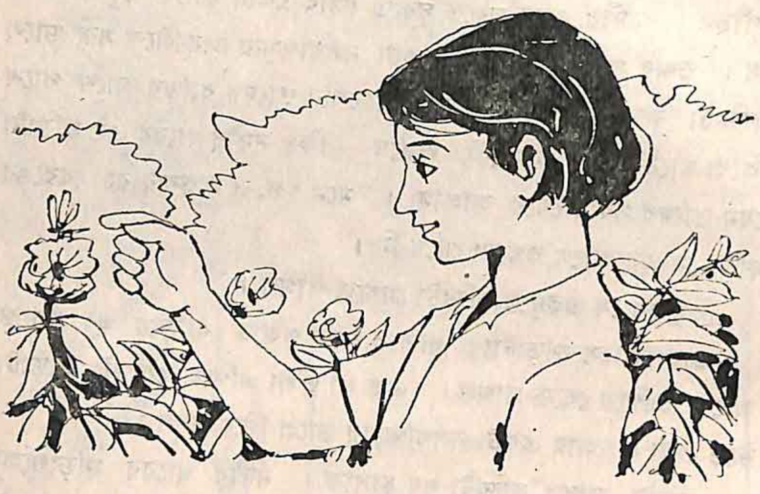
ছেলেটা ভাবল, ফড়িংটা খুব চালাক। নদীর ধারের ফড়িংগুলো কি খুব চালাক হয়? কিন্তু সে তো খুব কাছে যায় নি তার! একটু এগোতেই ফড়িংটা যেন কেমন করে বুঝতে পেরেছে যে, তাকে ধরতে যাচ্ছে সে।

যাই হোক ছেলেটা কিছুতেই পিছু হটবার ছেলে নয়। আবার সে ফড়িংটাকে ধরতে গেল। এবারেও ফড়িংটা উড়ে গেল। বসল আর এক জায়গায়।

তারপর আর একবার চেষ্টা করল সে।

কিন্তু না। এবারেও সেই একই ব্যাপার। ফড়িংটা যেন তার সঙ্গে ধরা ছোঁয়ার খেলা খেলছে।

আচ্ছা চালাক ফড়িং তো—মনে মনে ভাবল ছেলেটা। কিন্তু যেমন করেই হোক ওটাকে ধরতেই হবে। এত সুন্দর ফড়িংটাকে কিছুতেই ছাড়া যাবে না।



এইভাবে আরো কয়েকবার চেষ্টার পর ফড়িংটা এক সময় সত্যি সত্যিই ধরা পড়ল ছেলেটার হাতে। কিন্তু আহত হয়ে ফড়িংটা ধরা পড়ল। তার একটা ডানা ছেলেটার হাতের চাপে ভেঙ্গে গেছে। উড়বার শক্তিটুকু সে প্রায় হারিয়েই ফেলেছে।

ছেলেটার মনে খুব কষ্ট হল।

সে খুব আস্তে করে ফড়িংটাকে ঘাসের উপর বসিয়ে দিল। কিন্তু বসতে পারল না ফড়িংটা। ঘাসের উপর কাৎ হয়ে রইল।

ছেলেটার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা

করল ফড়িংটাকে স্বাভাবিক ভাবে বসাতে। কিন্তু কিছুতেই সে স্বাভাবিক ভাবে বসতে পারল না।

ওদিকে অনেকক্ষণ ছেলেকে না দেখে তাদের বাড়িতে তো খোঁজ খোঁজ রব উঠে গেল।

খুঁজতে খুঁজতে ছেলেটার বাবা এক সময় নদীর ধারে এসে দেখেন ছেলেকে বসে থাকতে।

কি রে? তুই এখানে?

ছেলেটা তখনো ফড়িংটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

এখানে কী করছিস তুই?—বাবা বললেন, ওদিকে আমরা সবাই যে তোকে সারা গ্রাম খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ছেলেটা বাবাকে দেখে কিন্তু উঠে দাঁড়াল না। বসে বসেই গম্ভীর ভাবে বলল, বাবা! তুমি মন্তর জানো?

মন্তর?

হ্যাঁ।

কেন রে?—বাবা বেশ কৌতূহলী হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, মন্তর দিয়ে কী হবে রে?

ছেলেটা ডানা ভাঙ্গা ফড়িংটাকে দেখিয়ে বলল, মন্তর দিয়ে তুমি এই ফড়িংটাকে ভাল করে দিতে পারবে?

কেন?—বাবা বললেন, কী হয়েছে ওর?

আমার হাতের চাপে ওর একটা ডানা ভেঙ্গে গেছে। আর ভাল করে উড়তে পারছে না।

ছেলেটা প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে কথাগুলো বলল।

বাবা বললেন, ওর ডানা ভাঙ্গল কি করে?

ওকে ধরতে গিয়েই আমার হাতের চাপে এমনটা হয়েছে।

কিন্তু আমি ওকে ভাল করে দেব কেমন করে ?—বাবা বললেন, আমি কি ডাক্তার ?

সেই জন্যেই তো বলছি বাবা, ডাক্তার না হলেও ভাল করে দেবার কোন মন্তর কি তোমার জানা নেই ?

ছেলের কথা শুনে বাবা এবার হো হো করে হেসে উঠলেন। এর জন্যে কোন মন্তরের দরকার হবে না বাবা। তুমি ওকে ঘাসের উপর শুইয়ে রেখে বাড়ি চলো। ও আপনিই ভাল হয়ে যাবে।

ভালো হয়ে যাবে ? সত্যি বলছ বাবা ?

হ্যাঁ, ঠাকুর ওকে ভাল করে দেবেন।

বাবার কথা বিশ্বাস করে ছেলেটা ফড়িংটাকে ঘাসের উপর শুইয়ে রেখে বাড়ি চলে এল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই ছেলেটা ছুটল সেই সরস্বতী নদীর ধারে যেখানে ঘাসের উপর সেই আহত ফড়িংটাকে শুইয়ে রেখে এসেছিল।

কিন্তু কই ? সেখানে তো ফড়িংটা নেই ! কোথায় গেল ?

আশেপাশের নলখাগড়ার ঝোপে ঝাড়ে অনেক খুঁজল ছেলেটা। কিন্তু কোথাও ফড়িংটার দেখা পেল না।

তবে কি ঠাকুর তাকে ভাল করে দেন নি ?

যাই হোক ছেলেটা তক্ষুণি বাড়ি ফিরে এল। বাবার কাছে গিয়ে বলল, বাবা! তুমি যে বললে ঠাকুর ফড়িংটাকে ভাল করে দেবেন কিন্তু কই ? নদীর ধারে কোথাও তো সেই ফড়িংটাকে দেখলাম না।

ছেলের কথা শুনে বাবা মৃদু হাসলেন। ছেলের মাথায় সস্নেহে

হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, ঠাকুর তো তাকে ভাল করেই দিয়েছেন বাবা। সে কি আর এখনো ওখানে থাকে? মনের খুশিতে সে অনেক দূরে উড়ে চলে গেছে।

উড়ে চলে গেছে?

হ্যাঁ।

ফড়িংটা যে মনের খুশিতে উড়ে চলে গেছে—তাই শুনে ছেলেটারও মন আনন্দে ভরে উঠল।

বড় হয়ে সেই ছোট্ট ছেলেটাই তো অপরাজেয় কথাশিল্পী হয়েছিলেন। নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী।

শরৎচন্দ্র বাল্যকালে মামার বাড়ি ভাগলপুরে থেকেই লেখাপড়া শেখেন। সেখান থেকেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁকে পড়াশুনো বন্ধ করে দিতে হয়। তারপর চাকরীর সন্ধানে নানা জায়গায় ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ান। অবশেষে রেঙ্গুনে সরকারী অফিসে তিনি কেরানীর পদে নিযুক্ত হন। এইখানেই বারো বছর চাকরী করেছিলেন। এখান থেকেই শুরু হয় তাঁর সাহিত্য সাধনা।

কুন্তলীন পুরস্কারপ্রাপ্ত 'মন্দির' গল্পটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত সাহিত্য নিদর্শন। তারপর পথের দাবী, রামের সুমতি, শ্রীকান্ত প্রভৃতি অনেক উপন্যাস, গল্প রচনা করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

তিনি জগত্তারিনী স্বর্ণপদক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি লিট উপাধি লাভ করেন।

শরৎচন্দ্র ছিলেন অপরাজেয় কথাশিল্পী। নিপীড়িত দরিদ্র অভাজনের ব্যথা বেদনার সার্থক রূপকার। তাঁর সাহিত্যে অসহায় দুর্বল নরনারীর দুঃখ দুর্গতি ও নানা সমস্যার চিত্র সহানুভূতি ও গভীর মমত্ব বোধের সঙ্গে অঙ্কন করেছেন।

তিনি নিজেই বলেছেন, "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কোন হিসাব নিলে না; নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।"

এই দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অমর ধামে চলে গেছেন।

হে মহাজীবন



দার্জিলিং মেল।

ট্রেনটা ছুটে চলেছে দার্জিলিং-এর দিকে। গাছপালা, মাঠ, বন, ঘর বাড়ি, গ্রাম, নগর সব যেন দু'ধারে ঠেলে ছুটে চলেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। পর পর অনেকগুলো রেল স্টেশন পেরিয়ে ছুটে চলে যায়। থামে না। বেশ কয়েকটা রেল স্টেশন-পার হয়ে যাবার পর কোন বড় স্টেশনে যেন নিজের খেয়ালেই দাঁড়িয়ে যায়। একবার কোন স্টেশনে গাড়িটা এসে দাঁড়ালেই যেন তক্ষুণি ছাড়তে চায় না। থেমে থাকে বেশ কিছুক্ষণ সময়।

এমনি একটা রেল স্টেশনে এসে ট্রেনটা থেমে যায়।

এমন কিছু বড় স্টেশন নয় এটা! তবুও গাড়িটা এখানে এসে থামে।

যাত্রীরা বেশ ভালভাবেই জানে যে, গাড়িটা এখন খুব তাড়াতাড়ি ছাড়বে না। তাই গাড়ির কামরা থেকে নেমে অনেকেই প্লাটফর্মের এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে। কেউ কেউ আবার প্লাটফর্মের উপর বসেই পড়ে।

যাত্রীদের মধ্যে একজন বলিষ্ঠ বাঙালী যুবক গাড়ির কামরা থেকে বেরিয়ে প্লাটফর্মেই পায়চারী করে বেড়াচ্ছিলেন।

ঠিক তখনই গাড়ির অন্য একটা কামরা থেকে এক ভদ্রলোক মুখ বাড়িয়ে তাঁকে ডেকে বললেন, ও মশাই শুনুন!

যুবকটি এগিয়ে গেলেন। বললেন, আমায় কিছু বলছেন?

হ্যাঁ—ভদ্রলোক বললেন, আমার স্ত্রী খুবই অসুস্থ। আমি কামরা ছেড়ে যেতেও পারছি না। দয়া করে আমাকে একটু জল এনে দেবেন?

নিশ্চয়ই—যুবকটি বললেন, এতে এত সঙ্কোচ বোধ করছেন কেন? কই? দিন। আপনার জলের পাত্রটা দিন। এক্ষুনি আপনার জল এনে দিচ্ছি।

ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে একটা ঘটি এগিয়ে দিলেন তাঁর হাতে।

যুবকটি তক্ষুণি চলে গেলেন জল আনতে।

প্লাটফর্মের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সাতজন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক গল্প করছিল।

খুব তাড়াতাড়ি জল আনতে গিয়ে একজন সৈনিকের গায়ে যুবকটির একটু ধাক্কা লেগে গেল।

সৈনিকেরা সবাই ফিরে তাকাল তাঁর দিকে।

যুবকটি খুবই লজ্জিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাদের বললেন, আপনাদের সঙ্গে অনিচ্ছা কৃত ভাবে ধাক্কা লাগার জন্য আমি খুবই দুঃখিত।

প্রত্যুত্তরে সৈনিকদের মধ্যে একজন তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালা-গালি দিতে লাগল।

হো হো করে হেসে উঠল আর ছ'জন সৈনিক।

বাঙালী যুবকটি এতে খুবই অপমানিত বোধ করলেন।

কিন্তু তখন আর কিছু না বলে তিনি চলে গেলেন জল আনতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জল ভরা পাত্রটা গাড়ির জানালা দিয়ে ভদ্র-লোকের হাতে তুলে দিলেন তিনি।

ভদ্রলোক অতি বিনীতভাবে বললেন, সত্যিই আপনি আমাকে বাঁচালেন। কী বলে যে আপনাকে……

ভদ্রলোকের আর কোন কথাই যুবকটির কানে পৌঁছল না। তিনি তখন হন্তদন্ত হয়ে সেই সৈনিকদের কাছে ছুটে গেলেন।

ক্ষমা প্রার্থনা করা সত্ত্বেও তারা তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছে। তার প্রতিশোধ তাঁকে নিতেই হবে।

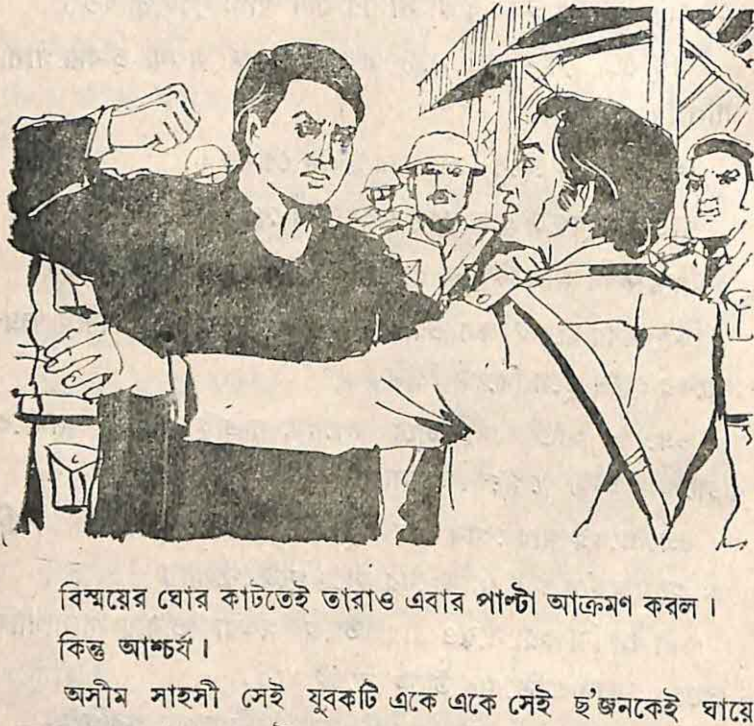
সৈনিক সাতজন তখন ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে গল্প করছিল।

সেই বলিষ্ঠ যুবকটি এবার কোন কিছু না বলেই অতর্কিতে তাদের একজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মুখের উপর সজোরে মারলেন কয়েকটা ঘুসি।

সৈনিকটি তো তক্ষুণি মুখে হাতচাপা দিয়ে বসে পড়ল।

কিন্তু আর ছ'জন?

তারা তো প্রথমে একেবারে হতভম্বের মত হয়ে গিয়েছিল। তারা ভাবতেই পারে নি যে এমন একটা কাণ্ড ঘটতে পারে।



বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই তারাও এবার পাল্টা আক্রমণ করল।

কিন্তু আশ্চর্য।

অসীম সাহসী সেই যুবকটি একে একে সেই ছ'জনকেই ঘায়েল করলেন। তারা সকলেই আহত হল।

এদিকে প্লাটফর্মের চারদিকে একটা হৈ হৈ ব্যাপার।

স্টেশন মাস্টার গার্ড সবাই ছুটে এল।

শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের গায়ে হাত দেওয়া হয়েছে। তাই স্টেশন মাস্টার, গার্ড এমন কি প্লাটফর্মের অনেকেই যুবকটির বিরুদ্ধে দাঁড়াল।

যুবকটি এবার পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে স্টেশন

মাস্টারের হাতে দিয়ে বললেন, এতে আমার নাম ঠিকানা দেওয়া আছে। প্রয়োজন হলে আপনারা আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কোন রকম দ্বিধা বোধ করবেন না।

এই কথা বলেই সেই বাঙালী যুবকটি রেলের কামরায় উঠে বসলেন।

বিস্মিত জনতার ভীড়ও ক্রমশ কমতে শুরু করে দিল।

একটু পরেই ট্রেনটা ছেড়ে দিল।

শেতাঙ্গ সৈনিক সাতজন কিন্তু ঐ যুবকটির বিরুদ্ধে আর কোন ব্যবস্থাই নেয় নি। কারণ একজন বাঙালী যুবক সাতজন শেতাঙ্গ সৈনিককে ঘায়েল করে মাটিতে ফেলে দিয়েছে—এটা কি কম লজ্জার কথা? কাজেই এই ঘটনাটা চাপা থাকাই ভাল।

সেদিনের সেই বাঙালী যুবকের নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 'বাঘা যতীন' নামেই তিনি পরিচিত।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার নয়াগ্রামে যতীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। যৌবনে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে একটা বাঘ মেরে যতীন্দ্রনাথ 'বাঘা যতীন' আখ্যা লাভ করেন।

বাঘা যতীন ছিলেন প্রকৃত বীর। তাঁর সংগঠন শক্তি ছিল অসাধারণ। শ্রীঅরবিন্দের সময়েই তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দেন। তখন থেকেই তিনি সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ে গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়াতেন বিপ্লবী সংগ্রামকে জোরদার করার জন্যে। তিনি অনেক বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

তখন শুরু হয়ে গেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। অস্ত্র বোঝাই জাহাজ আসবে জার্মান থেকে। পরিকল্পনা পাকা। সেই জাহাজ থেকে অস্ত্র

নিয়ে সেই সব অস্ত্র সারা ভারতে বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। যতীন্দ্রনাথ তাঁর চার সঙ্গী নিয়ে হাজির হলেন উড়িষ্যার বালেশ্বরে। সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতিষ পাল, চিত্তপ্রিয় রায়, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং নীরেন দাশগুপ্ত।

তাঁরা মহানদীর মোহনায় বুড়ি বালাম নামে এক জায়গায় সেই অস্ত্র বোঝাই জাহাজ আসার অপেক্ষায় রইলেন।

কিন্তু ভাগ্য বিধাতা তাঁদের অনুকূলে ছিলেন না। সেই জাহাজ চীনের সাংহাই বন্দরে আটকে পড়েছে। সে খবর কিন্তু বিপ্লবীদের কানে পৌঁছায় নি। তাঁরা বৃথা আশায় নীল সমুদ্রের পানে চেয়েই রইলেন। কিন্তু জাহাজ আর আসে না।

ওদিকে বিপ্লবীদের অভিসন্ধি সব জেনে ফেলেছে ইংরেজ সরকারের পুলিশ বিভাগ।

কলকাতা থেকে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট একদল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে হাজির হলেন মে বুড়ি বালাম।

বিপ্লবীরা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে থেকে ইংরেজ পুলিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। বাংলার বীর বিপ্লবীরা ঠিক করলেন যে, তাঁরা কিছুতেই ধরা দেবেন না। বাঘা যতীন বললেন শরীরের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।

কিন্তু পারলেন না। তাঁরা হেরে গেলেন। বুড়ি বালামের তীর বিপ্লবী তরুণদের রক্তে লাল হয়ে উঠল।

আহত যতীন্দ্রনাথ পরদিন হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বাংলা হারালো এক মহান বিপ্লবী বীরকে।

হে মহাজীবন



ঘটনাটা অনেকদিন আগেকার।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের ফটকের পাশে এই কলেজেরই একটি ছেলে কিছুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছিল। হয়ত সে কারো জন্য অপেক্ষা করছিল।

এমন সময় মেডিকেল কলেজের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক কর্ণেল পেক সাহেব ঘোড়ার গাড়ি করে আসছিলেন। ঠিক তখন একটা ট্রামও আসছিল সেই পথে। পেক সাহেবের ঘোড়ার গাড়িটা মেডিকেল কলেজের ফটকের কাছে এসে ঘুরে ঢুকতে গিয়ে ট্রাম গাড়িটার সঙ্গে ধাক্কা খেল। ঘোড়ার গাড়িটা ভেঙ্গে চুরে গেল। পেক সাহেব আঘাতের হাত থেকে কোন রকমে রক্ষা পেলেন। তাঁর

কোচম্যানেরও কোন আঘাত হয় নি। ঘোড়া দুটোও অক্ষত।

ট্রাম গাড়িটা থেমে রইল।

ভাঙা ঘোড়ার গাড়িটার দিকে পেক সাহেব কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। রাগে তাঁর সারা শরীর যেন কাঁপতে লাগল। চোখ দুটোও যেন লাল হয়ে উঠেছে। ট্রাম গাড়ির ড্রাইভারের দিকেও রোষদৃষ্টিতে একবার তাকালেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। ঠোঁট দুটো কেবল বার কয়েক যেন থর্ থর করে কেঁপে উঠল।

ট্রাম গাড়িটা এবার ঘন্টি বাজাতে বাজাতে চলতে শুরু করে দিল।

যে ছেলেটা এতক্ষণ ফটকের পাশে দাঁড়িয়েছিল, পেক সাহেব তার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি মেডিকেল কলেজের ছাত্র না?

ছেলেটা জবাব দিল, হ্যাঁ স্যার।

আমাকে তো তুমি চেনো?

হ্যাঁ স্যার, আপনাকে চিনবো না?

পেক সাহেব এবার একটু একটু করে ছেলেটার কাছে এগিয়ে এলেন। তার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, তুমি তো সবই দেখেছ, তাই না?

হ্যাঁ স্যার, ছেলেটা জবাব দেয়, সবই দেখেছি।

বেশ বেশ—পেক সাহেব আবার বলতে লাগলেন, তুমি এই দুর্ঘটনার সাক্ষ্য দেবে। দেখলে তো এর জন্য সম্পূর্ণভাবে ট্রামচালকই দায়ী। ট্রামটা যদি অত জোরে না আসত তাহলে কক্ষনো এমন দুর্ঘটনা ঘটত না। আমি কেস করব। আর কাউকে দরকার নেই। কেবল তুমিই সাক্ষ্য দেবে।

আজ্ঞে না স্যার—ছেলেটা বলল, ট্রাম চালকের একটুও দোষ নেই। দোষ আপনার গাড়ির কোচম্যানের। ও যদি গাড়িটা মোড় ঘোরার সময় অত জোরে না চালাত তাহলেই বরং দুর্ঘটনাটা ঘটত না। সাক্ষ্য আমি দিতে পারি কিন্তু সে সাক্ষ্য আপনার পক্ষে যাবে না।



ছেলেটার কথায় পেক সাহেব রাগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে চলে গেলেন।

এই ছোট্ট ঘটনা থেকে ছেলেটার অসাধারণ সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় পেক সাহেবও কিন্তু তাকে ছেড়ে দেন নি। ফলে ছেলেটাকে মেডিকেল কলেজ ছাড়তে হয়েছিল।

এই ছেলেটিই আমাদের ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা শহরে বিধানচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম প্রকাশচন্দ্র রায় এবং মাতা অঘোর কামিনী দেবী।

বিধানচন্দ্রের শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের শিক্ষা জীবন ছিল গৌরবময়। তার পর পাড়ি দিলেন ইংল্যাণ্ডে। সেখান থেকে চিকিৎসা বিদ্যার উচ্চতম ডিগ্রি লাভ করে দেশে ফিরে আসেন। অতি নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি কলকাতায় চিকিৎসা কার্যে ব্রতী হন। আর্তের সেবায় নিজের জীবনকে তিনি যেন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। অসহায় ব্যাধিক্লিষ্ট মানুষের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। অসাধ্য সাধন করার মত তিনি অনেকেরই জীবন দিয়েছেন ফিরিয়ে। চিকিৎসা জগতে তিনি ছিলেন এক প্রবাদ পুরুষ।

চিকিৎসকের কর্মব্যস্ত জীবনের সমান্তরালে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুসৃত পথেও এগিয়ে চললেন। আর্তের সেবার সাথে সাথে চলল দেশমাতৃকার সেবা।

ভারত অবশেষে স্বাধীন হল। সমস্যাজর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের কাণ্ডারী হতে হল বিধানচন্দ্রকে। দেশ গঠনের মহান ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হলেন তিনি। শুরু হল তাঁর কর্মজীবনের আর এক মহান অধ্যায়।

বিধানচন্দ্র ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রূপকার। নেতৃত্বের গুরুভার কাঁধে নিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের নব রূপায়নে আত্মোৎসর্গ করলেন।

তিনি জানতেন শিল্প সম্প্রসারণে বিদ্যুৎ শক্তির ভূমিকা অনন্য। তাই প্রথমেই তিনি বিদ্যুৎ উৎপাদনে মনোযোগী হলেন। এগিয়ে এলেন কৃষকদের সাহায্যের জন্য। রূপায়িত হল ময়ূরাক্ষী ও দামোদর প্রকল্প।

চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর ও কল্যাণী উপনগরী তাঁর অক্ষয় কীর্তির স্বাক্ষর। রাষ্ট্রীয় পরিবহণ ব্যবস্থা এবং হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্পের তিনিই প্রবর্তক।

শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তাঁর স্মরণীয় কীর্তি।

দেশ শাসন ও গঠন করতে গিয়ে তিনি কিন্তু কোনদিন চিকিৎসকের হাত গুটিয়ে নেন নি।

এই মহান কর্মযোগী বিধানচন্দ্র রায় ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

হে মহাজীবন



গ্রামের সরস্বতীপূজা। তাও আবার একালের নয়—সেকালের। তখনকার দিনে প্রতিমার পিছনে ও আশে পাশে এখনকার মত এত দৃশ্যসজ্জার আয়োজন হত না। সাদাসিধে পুজো। তবু সে পুজোর মধ্যেও কত আনন্দ ছিল।

বর্তমানে বাংলাদেশের একটি গ্রামে সেদিন শুভ্র বরণা বাগ্‌দেবীর অর্চনা হচ্ছে। গ্রামের ছোট বড় ছেলে মেয়েরা যে যেমন পেরেছে স্নান করে নতুন জামা-কাপড় পরে পূজা মণ্ডপে এসেছে বাগদেবীর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে। অনেকে আবার দোয়াত কলম বইপত্র

ছু-একখানা করে প্রতিমার পায়ের কাছে সাজিয়ে রেখেছে।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা অঞ্জলি দেবার জন্যে সবাই সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সেই ভিড়ের মধ্যে একটি ছেলে সকরুণভাবে সরস্বতী প্রতিমার দিকে যেন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তার জামা-কাপড় যদিও পরিষ্কার করে কাচা কিন্তু আর সকলের মত নতুন নয়। হয়ত সেইজন্যে মনে মনে সে কিছুটা কুণ্ঠা বোধ করছে।

ছেলেটার নাম মেঘনাদ। বড্ড গরীবের ছেলে।

অঞ্জলি দেবার সময় মেঘনাদও সবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। পুরোহিতমশাই সবাইকেই ফুল আর বেলপাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিতে লাগলেন। মেঘনাদও ফুল আর বেলপাতা নেবার জন্যে হাত বাড়াল।

পুরুতমশাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভেংচি কেটে বললেন, এ্যাঁ? তোর কি রে?

মেঘনাদ বলে, কিছু না ঠাকুরমশাই!

কিছু না তো এখানে এসে হাত বাড়াচ্ছিস কেন?

আমি অঞ্জলি দেব ঠাকুরমশাই—মেঘনাদ বলে, সকাল থেকে কিছু না খেয়ে আছি।

এ্যাঁ!—আবার ভেংচি কেটে উঠলেন পুরুতমশাই, তুই অঞ্জলি দিবি?

হ্যাঁ ঠাকুর মশাই।

কী সব্বনেশে কথা রে বাবা—পুরুতমশাই তাঁর চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন, এক্ষুনি এখান থেকে ভাগ বলছি। তুই ফুল বেলপাতা পাবি নে।

কেন ঠাকুর মশাই আমি অঞ্জলি দেব না ?

না ।

কিন্তু আমি তো সকাল থেকে একটু জলও খাইনি ।

আহা! মরে যাই আর কি ?—দাঁত মুখ খিঁচিয়ে পুরুতমশাই বললেন, কে দিব্যি দিয়েছে না খেতে ? যাও না বাড়িতে গিয়ে এক থালা পান্ত ভাত নিয়ে বসে যাও গে । অঞ্জলি দেবে ! ভাগ বলছি এখনো ।

অন্য সব ছেলে মেয়েরা এবার খিলখিল করে হেসে উঠল ।

অপমানে আর অভিমানে মেঘনাদ কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল । তারপর এক পা দু'পা করে পূজামণ্ডপ থেকে চলে এল । জাত পাতের দ্বন্দ্ব তাকে আঘাত দিল আজ ।



বাড়িতে দেওয়ালে একটা সরস্বতীর ছবি টাঙ্গানো ছিল। মেঘনাদ বাড়ি এসে সেই ছবিটার সামনে এসে দাঁড়াল। চোখ দুটো তার জলে ভরে এসেছে। হাত দুটো জোড় করে সে ছবিটার দিকে তাকিয়ে আপন মনেই বলতে লাগল, মা সরস্বতী! আর কোনদিন সবার সামনে তোমার অঞ্জলি দেব না। আমি আজ থেকে তোমার আরাধনা করব পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে।

হঠাৎ তখন মেঘনাদের মা ঘরে ঢুকলেন। ছেলে হাত জোড় করে সরস্বতীর ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে মা বললেন, কি হয়েছে রে তোর?

কিছু হয় নি মা।

কিছু হয় নি তো এমন করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

মা যাতে দেখতে না পান তাই দু' হাতে চোখের জল মুছে ফেলে মেঘনাদ আবার বলে, বলছি তো মা আমার কিছু হয়নি।

এবারে মা জিজ্ঞাসা করলেন, এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি?

পূজা মণ্ডপে।

অঞ্জলি দিয়েছিস?

না মা।

কেন রে?—মা বললেন, অঞ্জলি দিবি বলে সকাল থেকে কিছু খেলি নে, তবে……

মায়ের কথা শেষ হতে না হতেই মেঘনাদ বলে, বড্ড খিদে পেয়েছে মা, এখন আমায় কিছু খেতে দাও।

খিদে পেয়েছে? খাবি?—মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, কিন্তু অঞ্জলি দিবি নে?

না মা—মেঘনাদ জবাব দেয়, আমি আর অঞ্জলি দেব না।

কেন রে, অঞ্জলি দিবি না কেন?

তোমায় পরে সব বলব মা—সে বলে, এখন আমার বড্ড খিদে পেয়েছে ; কিছু খেতে দাও।

সত্যিই মেঘনাদ আর কোনদিনই অঞ্জলি দেয় নি।

নিরলস সাধনায় মগ্ন বিদ্রোহী ছেলেটি অঞ্জলি না দিয়েও বাগ্‌দেবীর আশীর্বাদ লাভ করেছিল। তাঁর আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদি বিশ্বের ইতিহাসে তাঁকে অমর করে রেখেছে। আধুনিক বিজ্ঞানে যে সব ভারতীয়দের অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে তাঁদের মধ্যে ডঃ মেঘনাদ সাহা অন্যতম।

ডঃ মেঘনাদ সাহা ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অধুনা বাংলা দেশের ঢাকা শহরের প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে শেওড়াতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় বাল্যকালে তাঁকে খুব কষ্টের মধ্যে দিয়ে লেখাপড়া শিখতে হয়। স্কুলে পড়ার সময় মাত্র বারো বছর বয়স থেকেই তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। স্কুলে আসতেন খালি পায়ে আর খাদি পোশাক পরে। একবার স্কুল ইনস্‌পেক্টর এতে বাধা দিলে তিনি তার প্রতিবাদ করেন। ফলে মেধাবৃত্তি ও বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

তারপর ঢাকার জুবিলি স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মেঘনাদ সাহা ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁর উদ্ভাবিত 'তাপীয় আয়নবাদ' তত্ত্বটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলোর মধ্যে একটি। তিনিই বিশ্বে সবার আগে প্রমাণ করলেন যে, সূর্যের প্রচণ্ড তাপে ও চাপে নিয়ত সূর্যের উপাদানগুলির পরিবর্তন হচ্ছে। তাঁর আবিষ্কারের সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে সূর্য ও নক্ষত্রের অনেক রহস্য জানা গেছে।

কলকাতায় 'সাহা ইনষ্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' তাঁরই হাতে গড়া।

মেঘনাদ একাধারে যেমন বিজ্ঞানসাধক অন্যদিকে তেমনি দেশ-হিতৈষী ও দেশের উন্নয়নমূলক কাজের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। দামোদর নদকে নিয়ন্ত্রণ করে বন্যার জলকে চাষের কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা তিনিই করেছিলেন। তাছাড়া তিনিই সরকারকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করার পরামর্শ দেন।

এই মহান বিজ্ঞানী ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

হে মহাজীবন



একবার গ্রীষ্মকালে দারুণ গরমে গ্রমের মানুষ সকলেই একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। জ্যৈষ্ঠ মাস। কিন্তু তখনো পর্যন্ত আকাশ থেকে এক-ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ে নি।

শহর নয়, পাড়া গাঁ। তাই বৈদ্যুতিক পাখার কথা সেখানে চিন্তা করাও যায় না।

উত্তর চব্বিশ পরগণার বনগাঁ মহকুমার বারাকপুর গ্রামের কথা বলছি। এই গ্রামেই বাস করতেন পথের পাঁচালীর স্রষ্টাবিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চারদিকে অসহ্য গরম হাওয়া। হাওয়াও সব সময় থাকে না। তখন শুধু গুমোট আবহাওয়া চলতে থাকে।

কোন কোনদিন বিকেলের দিকে আকাশের কোণে একটু আধটু মেঘ দেখতে পাওয়া যায়। সবাই একটু উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। হয়ত বৃষ্টি আসবে। কিন্তু না। সেই মেঘের টুকরোও এক সময় কোথায় যেন উড়ে চলে যায়। বৃষ্টি আসে না। দুপুর হলে লোকে ঘর থেকে বেরোতেও পারে না। রাত্রেও ঘুম নেই অনেকের চোখে।

বিভূতি ভূষণের চোখেও হয়ত ঘুম নেই। হয়ত কোন গল্পের প্লট তাঁর মাথার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে।

অন্ধকার থম্‌থমে রাত।

হঠাৎ কী যেন খেয়াল হল। বিছানা থেকে উঠে বসলেন বিভূতি ভূষণ। উত্তর দিকের জানালাটা দিয়ে বাইরেরদিকে একবার তাকালেন।

একটা বড় তেঁতুলগাছে ভর্তি অসংখ্য জোনাকি। মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে তাদের আলো।

ঘরের দরজা খুলে এবার তিনি খুব যেন সন্তর্পণে ঘরের বাইরে এলেন। জোনাকি জ্বলা তেঁতুল গাছটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর এক পা দু'পা করে এত রাতেও তিনি এগিয়ে গেলেন বাড়ির পিছনের বাঁশ বাগানের দিকে।

কোথাও কেউ নেই। কোথাও কোন শব্দ নেই। মাঝে মাঝে শুধু দু একটা নিশাচর পাখির ডাক। আর আছে তার সঙ্গে অবিশ্রান্ত ঝি ঝিঁ পোকার ডাক।

মাঝে মাঝে দমকা গরম হাওয়া বইছে। অশান্ত বাঁশবন সেই দমকা হাওয়ায় মাঝে মাঝে যেন মাটির কাছে নুয়ে পড়ছে।

বাঁশ বাগানের মাটিতে শুকনো বাঁশপাতা অনেক পুরু হয়ে জমে রয়েছে।

বিভূতি ভূষণ সেই বাঁশ বাগানের এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ কী যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর একটা



দেশলাই জ্বেলে সেই শুকনো বাঁশ পাতায় আগুন ধরিয়ে দিলেন।

দেখতে দেখতে সারা বাঁশবন সেই আগুনের শিখায় আলো হয়ে উঠল। সারা বাঁশ বাগানে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। মাথার উপরে বাতাসের একটানা হু হু শব্দ। অশান্ত বাঁশগাছগুলো যেন দ্বিগুণ উৎসাহে মাটির কাছে আছাড় খেতে লাগল।

সব মিলিয়ে তাঁকে সে রাত্রে কী যে আনন্দ দিয়েছিল কে জানে।

এদিকে গ্রামবাসীরা আগুনের শিখা দেখে কারো ঘরে আগুন লেগেছে মনে করে সকলে চারদিক থেকে ছুটে এল সেখানে।

সকলেই অবাক। তারা দেখল ছোট্ট একটা দেশলাইয়ের কাঠিতে হঠাৎ আলো হয়ে ওঠা বাঁশবাগানটার মতই লেখক বিভূতি ভূষণের চোখে মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে।

তিনি স্থির দৃষ্টিতে সেই অশান্ত বাঁশবন ও লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন।

ছেলেমানুষীর তাঁর অন্ত ছিল না। তাঁর এইসব শিশুসুলভ মনোভাবের জন্যে অনেকেই তাঁকে বলত চির শিশু।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁচড়াপাড়ার কাছে মুরতিপুর গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস উত্তর চব্বিশ পরগণার বনগাঁ মহকুমার বারাকপুর গ্রাম। তাঁর পিতার নাম মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম মৃণালিনী দেবী।

বিভূতি ভূষণ তাঁর পিতার কাছেই বাল্যশিক্ষা লাভ করেন। পরে বনগাঁর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কলকাতার রিপন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে তিনি আই. এ ও পরে ডিস্টিংসান সহ বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন এম. এ পড়তে। কিন্তু এই সময়ে বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে তাঁর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় এম. এ পড়া আর হয় না।

তারপর থেকেই তাঁর শুরু হল শিক্ষকতা জীবন। প্রথমে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপাড়া মাইনর স্কুলে শিক্ষক হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাথুরিয়াঘাটার জমিদারের সেক্রেটারী রূপে কাজে যোগদান করেন। পরের বছরেই তিনি উক্ত জমিদারী দেখা-শুনার জন্যে ভাগলপুরে যান। সেখানে বনভূমির নির্জনতা ও বিচিত্র প্রকৃতির মানুষের সংস্পর্শে এসে অনেক অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেন। এইখানেই তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' রচিত হয়। এখানকার পরিবেশেই সৃষ্টি হয় তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'আরণ্যক'।

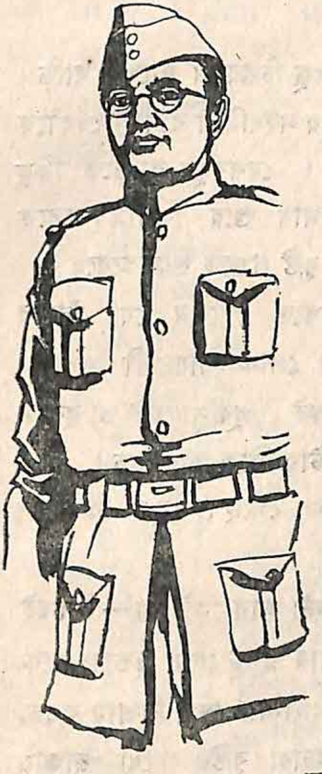
'প্রবাসী' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর বহু গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সুলেখক এবং আশ্চর্য সাহিত্য প্রতিভার অধিকারীরূপে অচিরেই তিনি সুনাম, সুখ্যাতি এবং সর্বজনের মুগ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেন।

প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর প্রায় একুশ বছর পরে তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি বনগাঁর কাছেই নেপালনগর হরিপদ বিদ্যাপীঠে শিক্ষকতা করতে থাকেন। আমৃত্যু তিনি এই বিদ্যালয়ের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই অমর কথা সাহিত্যিক পরলোক গমন করেন।

হে মহাজীবন



আমরা তখন পরাধীন ছিলাম।

ইংরেজরা আমাদের দেশ শাসন করত। কিন্তু তারা সব সময়েই ভয় করে চলত আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের — যাঁদের একমাত্র ধ্যান ও চিন্তা ছিল ভারত মাতাকে বিদেশীর কবলমুক্ত করে দেশে স্বাধীনতা আনা। আমাদের প্রিয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন সেই গণ সংগ্রামের একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। তিনি ছিলেন সংকল্পে কঠিন কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল ফুলের মতই কোমল। একদিনের একটা ছোট্ট ঘটনা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুভাষচন্দ্র যখন যেখানে যেতেন ইংরেজ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের লোকও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিছু নিত। কখনোই এ নিয়মের প্রায় ব্যতিক্রম হত না।

একদিন রাত্রে সুভাষচন্দ্র গেলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ি। দেশবন্ধু তখন বাড়ি ছিলেন না। দেশবন্ধুর সহধর্মিনী বাসন্তী দেবীকে সুভাষচন্দ্র ঠিক মায়ের মত শ্রদ্ধা করতেন। দেশবন্ধুর ব্যড়িতে কিছু জলযোগের পর সুভাষচন্দ্র সটান বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন। তখন বর্ষাকাল। ঝির্ ঝিরে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

বাসন্তী দেবী ঘরের জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন যে, তাঁদের বাড়ির সামনের ফুটপাতে একটা অচেনা লোক পায়চারী করছে। লোকটার লক্ষ্য কিন্তু দেশবন্ধুর বাড়ির দিকেই। খুব সহজেই তা বুঝতে পারা যায়, কারণ মাঝে মাঝেই সে বাড়িটার দিকে তাকাচ্ছে। ঝির ঝিরে বৃষ্টিতে লোকটা একেবারেই ভিজে গেছে; তবুও কিন্তু সে একইভাবে পায়চারী করছে।

বাসন্তী দেবী বুঝতে পারলেন যে, লোকটা আর কেউ নয়—নিশ্চয়ই গোয়েন্দা বিভাগের লোক। তাই তিনি এবার একটু হেসে সুভাষচন্দ্রকে বললেন, সুভাষ! তুমি তো বেশ দিব্যি বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছ, আর ওদিকে দেখ তোমার জন্যে এক বেচারা বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে।

সুভাষচন্দ্র অবাক হয়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, আমার জন্যে ভিজছে?

হ্যাঁ—বাসন্তী দেবী হেসেই জবাব দেন, তোমার জন্যেই তো।

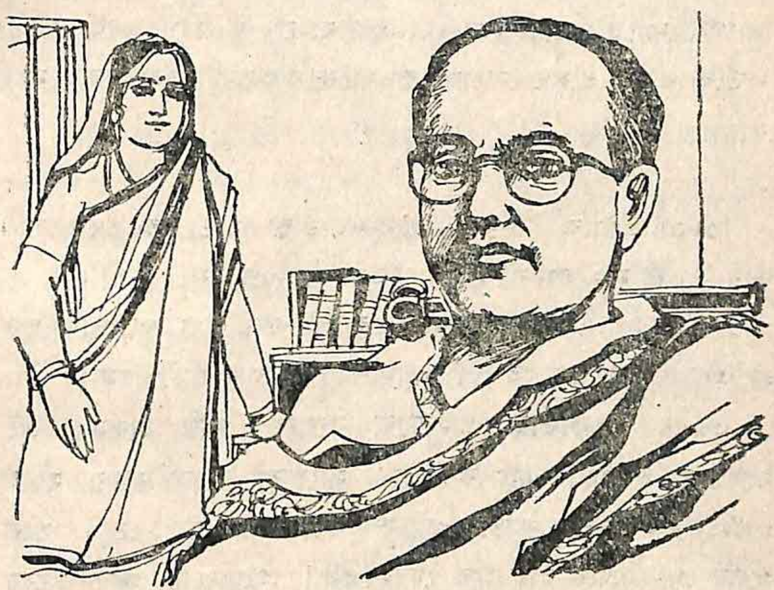
আপনি কার কথা বলছেন?

কার কথা আবার ?—বাসন্তী দেবী বলেন, তুমিই বলো না, কে এখন তোমার জন্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজতে পারে ?

ও হো ! এইবার বুঝেছি—সুভাষচন্দ্র বললেন, গোয়েন্দা ?

হ্যাঁ।

ভিজুক বেটা দাঁড়িয়ে—সুভাষচন্দ্র বললেন, যেমন ও আমার পিছু নিয়েছে।



ওর আর কী দোষ বলো—বাসন্তী দেবী কেমন যেন উদাসভাবে বললেন, ও বেচারী নিজের চাকরী বাঁচাবার জন্যেই তো এত কষ্ট করছে। একবার ভেবে দেখ তো সুভাষ! ওর ঘরেও তো স্ত্রী পুত্র আছে, ভাই বোন আছে। ওর জন্যে নাজানি তারাও হয়ত এখন

কত চিন্তা করছে। আর ওকেও তো জীবিকা নির্বাহের জন্যে কাজ করে যেতে হচ্ছে। বিদেশী সরকারের আদেশ হয়ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পালন করতে হচ্ছে।

বাসন্তী দেবীর কথা শুনে সুভাষচন্দ্রের মুখের স্বতঃস্ফূর্ত হাসিটা হঠাৎ কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। তাঁর চোখ দুটো তক্ষুণি অশ্রু সজল হয়ে উঠল। মনের এই দুর্বলতা যাতে বাসন্তী দেবীর কাছে ধরা না পড়ে তাই তিনি মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলেন। কিন্তু বাসন্তী দেবী আগেই দেখতে পেয়েছিলেন যে, সুভাষচন্দ্রের দু চোখ জলে ভরা। কর্তব্যে কঠিন হলেও নেতাজী সুভষাচন্দ্রের অন্তরটা ছিল ফুলের মতই কোমল।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার কটক শহরে সুভাষচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জানকী নাথ বসু এবং মাতা প্রভাবতী দেবী।

কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুলেই তাঁর প্রথম পড়াশুনো শুরু হয় এবং এই স্কুল থেকেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এরপর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। এই কলেজের ইংরাজী অধ্যাপক ওটেন সাহেবের ভারতীয়দের সম্বন্ধে অপমান জনক মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। ফলে কলেজ থেকে তাঁকে বার করে দেওয়া হয়। পরে স্যার আশুতোষের সহায়তায় তিনি স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকেই তিনি দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি, এ পাশ করেন। পরে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে আই. সি. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন।

তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতে অসহযোগ মুক্তি আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। সুভাষচন্দ্রও সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই সময় তিনি জাতীয় শিক্ষালয়ে অধ্যক্ষ, কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হন।

এরই কিছুদিন পরে মতবিরোধের ফলে কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং ফরোয়ার্ড ব্লক নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন।

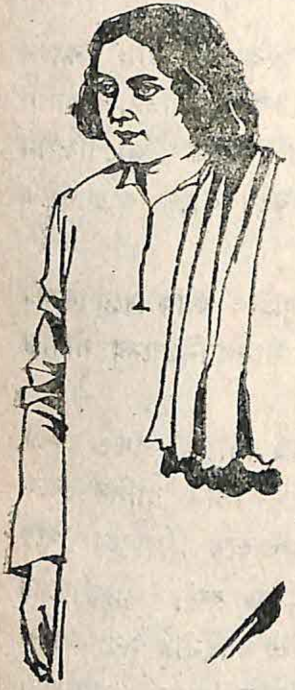
তাঁর জীবন ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাস। সরকার বিরোধী কার্যকলাপের জন্যে তাঁকে বার বার কারারুদ্ধ হতে হয়।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে নিজের কলকাতার বাড়ি থেকে অন্তর্ধ্যান হন। আফগানিস্তানের সীমান্ত হয়ে মস্কোর পথে বার্লিন গিয়ে পৌঁছান।

বার্লিন রেডিওর মাধ্যমে তিনি ভারতবাসীকে উদ্দেশ্য করে স্বাধীনতার যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান জানান। তিনি বার্লিন থেকে ডুবো জাহাজে করে জলের নীচ দিয়ে টোকিও হয়ে সিঙ্গাপুরে গিয়ে হাজির হন। সেখানেই তিনি জাপানীদের হাতে বন্দী ভারতীয়দের নিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেন এবং ঐ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হন। বাহিনীর সবাইকে সুভাষচন্দ্র বীজমন্ত্র দিলেন 'জয়হিন্দ'। তখন থেকেই তিনি হলেন নেতাজী।

জাপানের এক সংবাদপত্রে প্রচারিত হয় যে, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর নাকি মৃত্যু হয়েছে।

হে মহাজীবন



কাজী নজরুল ইসলাম তখন কলকাতায় একটা ছোট ফ্ল্যাটে একাই থাকেন। একটা কুড়ি বাইশ বছরের ছেলে তাঁর রান্না বান্না করে দেয়। টুকিটাকি আরো অনেক কাজ করে দেয় সে। কবি কিন্তু তাকে কখনোই তাঁর ভৃত্য বলে মনে করেন না। রাঁধুনী ছেলেটি ঠিক যেন তাঁর ছোট ভাই।

নজরুলের খ্যাতি তখন চারদিকে। বিদ্রোহী বলে তখন তাঁকে নিয়ে চারদিকে হৈ চৈ। কিন্তু আর্থিক অবস্থাটা তখন তাঁর মোটেই সচ্ছল ছিল না।

একদিন দুপুরের কিছু আগে এক ভদ্রলোক এলেন

কবির সঙ্গে দেখা করতে।

কবি নজরুল তখন একটু ব্যস্ত ছিলেন। একটু পরেই তাঁকে কোথায় যেন যেতে হবে। কারা যেন আসবে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে। কোথায় কোন সভা সমিতিতেই হবে।

ঠিক তখনই সেই রাঁধুনী ছেলেটি তাঁর সামনে এসে ডাকল, বাবু।

নজরুল মুখ তুলে তার দিকে তাকালেন। বললেন, কি হয়েছে?

একজন লোক এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

কোথায়?

বাইরে বসে আছেন—ছেলেটি বলল, ডাকবো?

ডাকো।

ভদ্রলোক নজরুলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বয়স খুব বেশী নয়। বছর চল্লিশেক হবে। একমাথা উস্কো খুস্কো চুল। ময়লা ধুতি পাঞ্জাবী পরা লোকটির মুখের দিকে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন নজরুল। ভাবলেন নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের কবিতার বাতিক আছে। হয়ত কবিতা প্রকাশের কোন রকম সহায়তা পাবার আশায় উনি এসেছেন।

ভদ্রলোকের চোখে মুখে অতি বিনম্রভাব। অথচ মুখে কিছু বলছেনও না।

নজরুল তাঁকে সামনের চেয়ারে বসতে বললেন।

ভদ্রলোক বসলেন।

নজরুল বুঝতে পারলেন, কোন তৃতীয় ব্যক্তির সামনে হয়ত তিনি কিছু বলতে কুণ্ঠা বোধ করছেন। তাই তিনি ইশারায় রাঁধুনীকে অন্য ঘরে যেতে বললেন।

ছেলেটা তক্ষুণি অন্য ঘরে চলে গেল।

তারপর নজরুল ভদ্রলোককে বললেন, এইবার বলুন আপনি কি বলছেন।

ভদ্রলোক বললেন, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম একটা বিশেষ দরকারে।

হো হো করে হেসে উঠলেন নজরুল। বললেন, দরকার ছাড়া আমার মনে হয় কেউ কারো কাছেই আসে না। কিন্তু আপনার দরকারটা কি বলুন তো।

আমার শ খানেক টাকার খুব দরকার।

নজরুল বললেন, এক শো টাকা?



হ্যাঁ।

হাসলেন নজরুল। বললেন, এক শো টাকা তো আমার কাছে নেই।

আপনাকে দিতেই হবে টাকাটা—ভদ্রলোক বললেন, আমি অনেক আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।

নজরুল কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, আপনার আশা পূরণ করতে পারলে আমি খুবই খুশী হতাম। কিন্তু সত্যিই আমার কাছে এত টাকা নেই।

কথাটা বলেই নজরুল পকেটে হাত পুরে একখানা দশ টাকার নোট বার করলেন। ঐ দশ টাকার নোটখানাই ছিল তাঁর সেদিনের সম্বল। তিনি ঐ নোটখানা ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, আপনাকে একেবারে নিরাশ করব না, এই দশটা টাকা নিন।

ভদ্রলোক টাকাটা হাত বাড়িয়ে নিতে গিয়ে বললেন, জানেন আমার দু'দিন খাওয়া হয় নি।

দু'দিন আপনার খাওয়া হয় নি ?

না।

নজরুল এবার ওঁর মুখের দিকে ভালো করে তাকালেন। সত্যিই তো! বেচারীর মুখ চোখ যেন একেবারে শুকিয়ে গেছে। ওঁর না খাওয়ার কথা শুনে মনে মনে খুবই দুঃখ পেলেন নজরুল। তাই তিনি তাঁকে বললেন, আমার এখানে খেতে আপনার কোন আপত্তি আছে কি ?

না না—ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, আপত্তির কি আছে তবে.........

ভদ্রলোকের কথা শেষ করতে না দিয়েই নজরুল বললেন, তাহলে আজ আমার এখানে দুটো খেয়ে যান।

ভদ্রলোক তক্ষুণি বললেন, আমার খাওয়ার জন্যে আপনাকে অত ব্যস্ত হতে হবে না। আপনার কাছ থেকে তো দশটা টাকা পেলাম। দু'দিন না খেলেও অন্ততঃ আজকের দিনটা আমার খাওয়ার অভাব হবে না।

তা হোক—নজরুল বললেন, আপনি আমার আজকের অতিথি একবার যখন আমার কানে গিয়েছে যে দু'দিন আপনার পেটে কিছু পড়ে নি, তা'ছাড়া আমার এখানে যখন আপনার খেতেও কোন রকম আপত্তি নেই, তখন অভুক্ত অবস্থায় আপনাকে যেতে দিতে পারি না।

ভদ্রলোক একটু হাসলেন।

নজরুল তক্ষুণি সেই রাঁধুনী ছেলেটিকে ডেকে বললেন, এই বাবু আজ আমাদের এখানে খাবেন। তুমি এক্ষুণি যা রান্না করা আছে তাই দিয়ে এঁকে খেতে দাও।

রান্না হয়ে গিয়েছিল তার অনেকক্ষণ আগেই। রাঁধুনী ছেলেটি ভাবল, ভদ্রলোক বোধ হয় বাবুর বন্ধুই হবেন। তাই সে বেশ যত্ন-আত্যি করে তাঁকে মাংস ভাত খেতে দিল। ভদ্রলোক বেশ খেতেও পারেন যা হোক। সে তো অবাক হয়ে গেল ওঁর খাওয়া দেখে। একাই প্রায় তিনজনের খাওয়া খেয়ে নিলেন তিনি।

পড়ে রইল অল্প ভাত আর সামান্য একটু মাংসের ঝোল।

নজরুলকে সেদিন ঐ অবশিষ্ট দুটো ভাত আর মাংসের ঝোলটুকু খেয়েই কাটাতে হয়েছিল। আর রাঁধুনী ছেলেটাকে খেতে হয়েছিল একটা হোটেলে।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে এক দরিদ্র মুসলমান পরিবারে নজরুলের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল কাজী ফকির আহম্মদ আর মাতার নাম জায়েদা খাতুন। মাত্র আট বছর যখন নজরুলের বয়স তখনই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। দাদা মা ভাই আর বোনকে বাঁচাবার তাগিদে বালক নজরুল ছুটলেন কয়লা খনিতে শ্রমিকের কাজ করতে। তারপর থেকেই চলল নানাভাবে জীবিকার অন্বেষণ। নজরুলের ডাক নাম ছিল দুখু মিয়া।

সংসারের অভাব অনটনের জন্যে তাঁর লেখাপড়া বেশী দূর এগোয় নি। তবে এরই মধ্যে তিনি আরবি, ফারসি, উর্দু এবং বাংলা ভাষা বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে শিখেছিলেন। ফজলে করিম নামে এক দূর সম্পর্কের কাকার কাছে নজরুল গান শিখতে লাগলেন। এই সময়েই রাঢ় অঞ্চলের জনপ্রিয় লেটো গানের দলে যোগ দিলেন তিনি। নতুন নতুন লেটো গান রচনা করতে লাগলেন নজরুল। আসানসোলে এক রুটির দোকানেও কিছুদিন তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। পরে আবার গিয়ারশোর রাজ স্কুলে ভর্তি হয়েছেন। এবারেও কিন্তু তাঁর পড়াশুনো এগোল না।

যখন তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্র তখনই তিনি সেনা বিভাগে ঢুকে পড়লেন। সৈনিক বেশে তিনি ঘুরে বেড়ালেন নানা দেশ।

সেনা বিভাগে যোগ দেওয়ার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। তিনি ভেবেছিলেন যুদ্ধে গিয়ে যুদ্ধ বিদ্যা শিখে এসে নিজেই বিরাট এক সৈন্য বাহিনী গঠন করবেন এবং সেই সৈন্য বাহিনীর সাহায্যেই তিনি এদেশ থেকে ইংরেজদের উচ্ছেদ করবেন—পরাধীন ভারতকে এনে দেবেন স্বাধীনতা।

সেনা বাহিনীতে থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। রচনা করলেন 'মুক্তি' 'বিদ্রোহী' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা। 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখে তিনি বিদ্রোহী কবি নামেই পরিচিত হলেন।

সেনাবাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কয়েকটি সংবাদপত্র ও সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনাও করেছিলেন। চারদিকে তাঁর অজস্র রক্তক্ষরা কবিতা প্রকাশিত হতে লাগল। তখন তিনি ইংরেজ সরকারের রোষ দৃষ্টিতে পড়লেন। ফলে কবিকে আবদ্ধ হতে হল ইংরেজ সরকারের কারাগারে।

অসহায় কৃষক মজুরের সাথী বিদ্রোহী নজরুলের আর এক পরিচয়, তিনি সঙ্গীত রচনাকার এবং সুগায়ক। তাঁর রচিত অজস্র গান, বাংলা গানের ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ।

কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেও নজরুলের প্রতিভা ছিল বিচিত্র-গামী। তিনি গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর রচিত কাব্য গ্রন্থের মধ্যে অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, দোলন চাঁপা, প্রলয় শিখা, সাম্যবাদী, সর্বহারা, সঞ্চিতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীন ভারত সরকার নজরুলকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মান জানায় জগত্তারিনী স্বর্ণ পদক দিয়ে। আর রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মান সূচক ডি-লিট উপাধি প্রদান করেন।

শেষ জীবনে কবি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন কঠিন মস্তিষ্ক রোগে। ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে বর্তমান বাংলা দেশের ঢাকা শহরে কাজী নজরুল ইসলাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হে মহাজীবন



ছেলেদের সবচেয়ে বেশী ভয় ছিল ইতিহাসের ক্লাশটাতে। ইতিহাসের মাস্টারমশাইকে দেখলেই তাদের বুকটা ভয়ে দুরু দুরু করতে থাকে। কাকে যে কোন পড়াটা ধরবেন তা আগে থেকে আন্দাজ করার সাধ্য কারো নেই। পড়া না পারলে শাস্তিটাও নেহাৎ কম হত না। অনেকটা লঘু পাপে গুরু দণ্ডের মত। তাই সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করত অন্তত ইতিহাসের পড়াটাকে কণ্ঠস্থ রাখতে। কিন্তু মাস্টারমশাই সামনে এসে দাঁড়ালে অনেক সময় সেই কণ্ঠস্থ পড়াটা কিছুতেই যেন ঠোঁটস্থ হতে চাইত না। আর তখনই হত যত গণ্ডগোল। আর ইতিহাসের

ক্লাশটাও মনে হত যেন খুব বড়। কিছুতেই যেন ঘণ্টা পড়তে চাইত না।

তবু এদের মধ্যে সুকান্ত নামে ছেলেটার বেশ সাহস আছে বলতে হবে। পড়া তার তৈরী থাকুক আর না-ই থাকুক, আর সকলের মত সে কিন্তু মোটেই ভয় পেত না।

একদিন ইতিহাসের ক্লাশ চলছে। মাস্টারমশাই ইচ্ছামত এক একজনকে এক একটা প্রশ্ন করছেন। যাদের প্রশ্ন করা হয়ে গেছে তাদের তো গা থেকে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেছে। আর তখনো যাদের পড়া ধরা হয় নি তারা তো ভয়ে থরহরি কম্পমান।

সুকান্ত ছেলেটা ছিল ক্লাশের মাঝামাঝি এক জায়গায়। ইতিহাসের মাস্টারমশাইকে নিয়ে তখন তাঁর একটুও মাথা ব্যথা নেই। এক মনে সে তখন একটা গল্পের বই পড়ে চলেছে।

তার সহপাঠীরা তার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে। তাদেরই ভয় করছে—কখন যে একটা প্রশ্নের বাণ এসে সুকান্তের বুকে বিঁধবে কে জানে!

ঠিক তাই। একটু পরেই মাস্টারমশাই সুকান্তকেই একটা প্রশ্ন করলেন।

সুকান্ত নির্বিকার। সে তখনো একমনে গল্পের বই পড়ে চলেছে। মাস্টারমশাই ফের তাকে সেই একই প্রশ্ন করলেন।

তখনো সুকান্ত নিরুত্তর। জবাব দেওয়া তো দূরের কথা সে বই থেকে মুখই তুলছে না। তার যেন একেবারেই খেয়াল নেই যে এখন সেই ভয়ঙ্কর ইতিহাসের ক্লাশ চলছে।

মাস্টারমশাই বুঝতে পারলেন যে, সুকান্ত যেন কী পড়ছে। তাই তিনি বললেন, অত মন দিয়ে কী পড়া হচ্ছে শুনি?

সহপাঠীরা এবার ভাবল, আর রক্ষা নেই। সুকান্তর সামনে এখন মহা বিপদ। ক্লাশের সবাই তাকে কিন্তু খুব ভালবাসত। তাই তার বিপদ থেকে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে লাগল তারা। একজন তো হাতের কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে সজাগ করে দিল। আর একজন উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিল, ও ইতিহাসই পড়ছে স্যার।

ইতিহাস পড়ছে?

হ্যাঁ স্যার।

বটে—মাস্টারমশাই বললেন, কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না কেন?

আর একজন সহপাঠী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, স্যার ও কদিন ধরে কানে শুনতে পাচ্ছে না।

কানে শুনতে পাচ্ছে না?

না স্যার—ছেলেটা বলে, কানে যেন ওর কী হয়েছে। ডাক্তার দেখাচ্ছে·········

ছেলেটার কথা শেষ করার আগেই দেখা গেল মাস্টারমশাই চেয়ার ছেড়ে উঠে সুকান্তের দিকে এগিয়ে আসছেন।

কাছে এসেই মাস্টারমশাই খপ্ করে সুকান্তের গল্পের বইটা আবিষ্কার করে ফেললেন, মাথা নেড়ে বললেন, এই জন্যেই তুমি কানে শুনতে পাচ্ছো না। তোমাকে ওষুধ দেওয়া দরকার।

সুকান্ত মাথা নীচু করে মুখখানাকে কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ মাস্টারমশাই একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, দাঁড়াও বেঞ্চের উপর।

অগত্যা সুকান্তকে বেঞ্চের উপর দাঁড়াতে হল।

মাস্টারমশায়ের সুরটা যেন একটু নরম হল, বললেন, স্কুলে এসে এভাবে গল্পের বই পড়ো কেন?

সুকান্ত তার কোন জবাব দেয় না। সহপাঠীদের মধ্যে একজন খুব সাহস করে বলে, স্যার ও কবিতা লেখে! তাই ওকে অনেক বই পড়তে হয়।

এ্যাঁ! কবিতা লেখে?—মাস্টারমশায়ের কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর, উনি তাহলে কবি?

হ্যাঁ স্যার—ছেলেটি আরো বলে, এবারের আমাদের স্কুল ম্যাগাজিনে ওর একটা খুব সুন্দর কবিতা বেরিয়েছে।

তাই নাকি?— মাস্টারমশাই বললেন, তাহলে তো ওর জন্যে আরো একটু কড়া ওষুধের দরকার।

তখনই ঘন্টা পড়ে গেল। সেদিনের মত ইতিহাসের ক্লাশ শেষ হল। মাস্টারমশাইও চলে গেলেন।

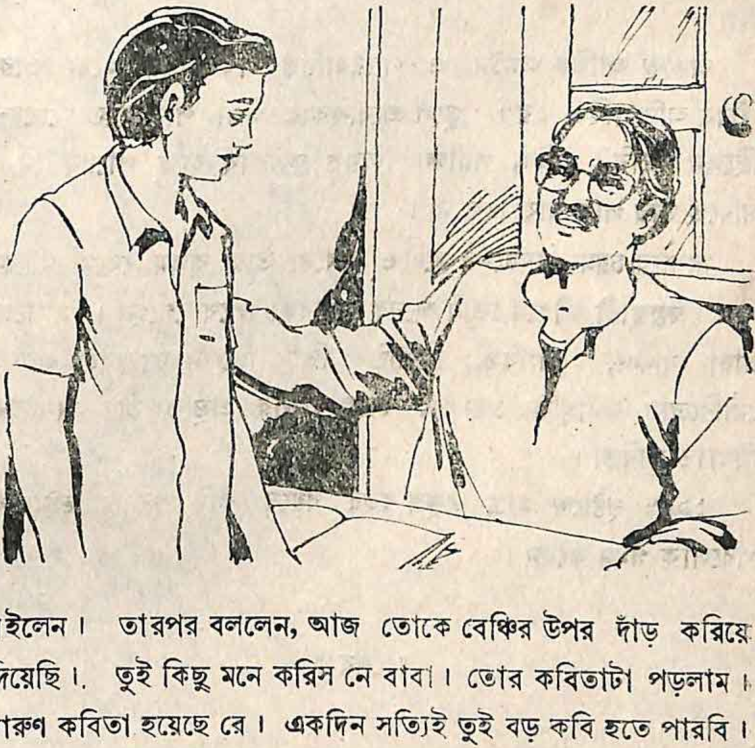
সেইদিনই টিফিনের সময় টিচার্স রুম থেকে ডাক পড়ল সুকান্তর। ইতিহাসের মাস্টারমশাই তাকে ডাকছেন।

সুকান্তর বুকটা তো দুরু দুরু করতে লাগল। আবার কী শাস্তি কপালে আছে কে জানে! এর জন্যে তার বন্ধুরাও কম চিন্তিত নয়।

সুকান্ত হাজির হল টিচার্স রুমে ইতিহাসের মাস্টারমশায়ের সামনে।

কিন্তু ও কি ! মাস্টারমশায়ের হাতে এ বছরের স্কুল ম্যাগাজিন-খানা, যার মধ্যে রয়েছে সুকান্তর কবিতা !

মাস্টারমশাই কিছুক্ষণ সুকান্তর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে



রইলেন। তারপর বললেন, আজ তোকে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। তুই কিছু মনে করিস নে বাবা। তোর কবিতাটা পড়লাম। দারুণ কবিতা হয়েছে রে। একদিন সত্যিই তুই বড় কবি হতে পারবি। তুই আরো কবিতা লিখে যা রে।

এরপর থেকে ইতিহাসের মাস্টারমশাই তাকে কবিতা লেখায় উৎসাহ দিতে লাগলেন। সুকান্ত নামে সেদিনের সেই ছেলেটিই বড় হয়ে হলেন বিখ্যাত কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় সুকান্তর জন্ম হয়। পিতার নাম নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং মাতার নাম সুনীতি দেবী। পিতার পেশা ছিল পূজা অর্চনা করা। তা ছাড়া তাঁর একটি বইয়ের দোকানও ছিল।

অত্যন্ত আর্থিক অনটন ও পারিবারিক বিপর্যয়ের মধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। স্কুলে প্রবেশিকার গণ্ডী পার হতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরীক্ষা দিয়েও কৃতকার্য হতে পারেন নি। গণিতে তাঁর পাশ মার্ক ছিল না।

সংসারে চরম অনটনের মধ্যেও কখনো তাঁর কলম থেমে থাকে নি। স্বল্পস্থায়ী জীবনে তিনি অনেক কবিতা লিখে গেছেন। সমাজে যারা বঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত তিনি ছিলেন তাদেরই কবি। নৌবিদ্রোহ, বন্দীমুক্তি, ১লা মে, কালোবাজার প্রভৃতি তাঁর অন্যতম বিখ্যাত কবিতা।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে মাত্র একুশ বছর বয়সে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য পরলোক গমন করেন।

॥ শেষ ॥